

জীবন গোধূলি

লিও তলস্তয়

অনুবাদ

শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী

প্রদীপ পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২।

প্রকাশক :—
ক্ষিতীশচন্দ্র মজুমদার
প্রদীপ পাবলিশার্স
৩/২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

মুদ্রক :—
শ্রীইন্দ্রজিত পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ শিল্পী :—
পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম :—দুই টাকা।

ভূমিকা

'ডেথ অব ইভান ইলিচ' তলস্তয়ের পরিণত বয়সের লেখা। প্রকাশ কাল ১৮৮৬ সাল। উপন্যাসখানি তলস্তয়ের শ্রেষ্ঠ লেখার অন্যতম। সাধারণ মানুষের মত সুখ-শান্তি আরাম-আয়াসভরা সাংসারিক জীবনের নিশ্চিন্ততা-প্রয়াসী ইভান ইলিচের অন্তিম উপলব্ধি যদি একান্তভাবে তার নিজস্ব অনুভূতি হত, সেই মর্মান্তিক উপলব্ধি যদি সার্বজনীনত্ব না পেত তো রসোত্তীর্ণ সার্থক সাহিত্য হিসাবে উপন্যাসখানি কোন মর্যাদা পেত না। এর অনন্যসাধারণত্বের মূলে আছে সার্বজনীনত্বের আবেদন।

অন্তরঙ্গ প্রিয়-পরিজনের সান্নিধ্যেও মহাযাত্রী মানুষ নিঃসঙ্গ। তার নিগূঢ় বেদনার সমব্যথী নেই। নেই কোন সমমর্মী। কেউ বোঝে না তিলে তিলে পলে পলে নিভে যাওয়ার, অজানা অন্ধকারের গর্ভে চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার মর্মান্তিক বেদনা। জীবন গোধূলির এই নিঃসঙ্গতা, এই নিগূঢ় বেদনার দুঃসহ করুণ মর্মপীড়া বাঙ্‌ময় হয়ে উঠেছে ইভান ইলিচের অন্তিম জীবনচিত্রে। এই বেদনাবিধুর অনুভূতি, অন্তরঙ্গের পরিবেশের মধ্যেও এই একাকীত্ববোধ সার্বজনীন। সবাই আমরা ভাবী ইভান ইলিচ। জীবনকে ভালবেসে, বাঁচার অক্লান্ত আকুতি নিয়ে একদিন না একদিন সবাই মুখোমুখি দাঁড়াবে এই সুনিশ্চিত ভবিতব্যের। পেছনে চেয়ে জীবনের সব পুঁজি হয়ত সেদিন অর্থহীন মনে হবে। আর গোটাজীবন মনে হবে ভুলে-ভরা। আত্মবঞ্চনার সব যুক্তি সেদিন মেকি বলে মনে হবে—দুঃসহ মর্মপীড়া আর সংশোধনের আগ্রহ নিয়ে অসহায়ের মত আত্মসমর্পণ করতে হবে অমোঘ পরিণামের কাছে। তলস্তয়ের কল্পলোকের ইভান ইলিচ তাই সর্বকালের সর্বদেশের সাধারণ মানুষ।

অনুবাদক—

বিশাল আদালত-ভবনে মেলভিনস্কি মামলার বিচার চলছে। আদালতের বিরতির সময় সরকারী উকীল আর বিচারকদের আড্ডা জমে ইভান এগারভিচ শেবেকের গোপন কক্ষে। কথায় কথায় সেখানে প্রখ্যাত ক্রাসভস্কি মামলার প্রসঙ্গ ওঠে। ফেদর ভাসিলিভিচ জোর দিয়ে বলেন যে বিষয়টি তাদের এখতিয়ারে নয়। ইভান এগারভিচ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। পেতর ইভানভিচ প্রথম থেকেই এ আলোচনায় যোগ দেয়নি। এখুনি যে গেজেটখানি বিলি করা হয়েছে নীরবে সে তার উপর চোখ বোলাচ্ছিল।

সহসা সে বলে ওঠে, সে কি! ইভান ইলিচ মারা গেছেন?

—বলেন কি?

—এই তো রয়েছে—পড়ে দেখুন না! সন্থ-ছাপা ভেজা কাগজখানা ফেদর ভাসিলিভিচের হাতে বাড়িয়ে দেয় পেতর ইভানভিচ।

কাল রেখার বেষ্টনীর মধ্যে এই কয়টি কথা লেখা ছিল: গভীর শোকাতুরা প্রাসকভিয়া ফেদরভনা গলভিনা এতদ্বারা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবকে তাহার প্রিয় স্বামী বিচারক ইভান ইলিচ গলভিনের মৃত্যু-সংবাদ জানাইতেছেন। ১৮৭২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। শুক্রবার বিকাল একটার সময় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে।

উপস্থিত ভদ্রজনের সহকর্মী ছিলেন ইভান ইলিচ এদের সকলেই তাকে পছন্দও করতেন। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন তিনি। এ রোগ নাকি সারে

না। চাকরির পদটি এখনও তার জন্য শূন্য রাখা হয়েছে। কথা উঠেছে, তিনি মারা গেলে আলেকসিভ তার শূন্য পদে নিযুক্ত হবে; আর ভিন্নিকভ কিংবা স্তাবেল পাবে আলেকসিভের পদ। কাজেই মৃত্যু সংবাদ শুনে গোপন কক্ষে উপস্থিত ভদ্রজনের মনে প্রথমত নিজেদের কিংবা পরিচিতদের পদ-পরিবর্তন আর পদোন্নতির কথাই জাগ্রত হয়

ফেদর ভাসিলিভিচ ভাবে, আমি নিশ্চয় স্তাবেল কি ভিন্নি-কভের পদ পাব। অনেকদিন আগেই সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে; আর সেই প্রদোন্নতির মানে ভাতা বাদে বছরে অতিরিক্ত আরও আটশ' রুবল মাইনে বৃদ্ধি।

পেতর ইভানভিচের মনে হয়, এইবারে কালুগা থেকে শালার বদলীর জন্য আবেদন করতে হবে। তাতে স্ত্রীও খুশী হবে। তখন আর বলতে পারবে না যে তার আত্মীয়ের জন্য আমি কিছু করিনি।

—আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে বিছানা ছেড়ে এবার আর ওকে উঠতে হবে না! বড় দুঃখের কথা! জোরে জোরে বলে পেতর ইভানভিচ।

—কিন্তু আসলে ওর হয়েছিল কি?

—ডাক্তার বলতে পারেনি! অন্তত তাদের মতের মিল হয়নি···সবাই আলাদা মত প্রকাশ করেছে। শেষবার যখন তাকে দেখতে গেলাম তখন তো ভালই দেখেছিলাম।

—প্রায়ই যাব ভেবেছি, কিন্তু ছুটির পর আর যেতে পারিনি।

—সম্পত্তি-টম্পত্তি কিছু আছে কি?

—স্ত্রীর কিছু আছে হয়ত…তবে তেমন কিছু নয়!

—তার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে…কিন্তু বড্ড বেশী দূরে বাড়ী।

—তার মানে আপনার বাড়ী থেকে দূরে। তা সব জায়গাই তো আপনার বাড়ী থেকে দূরে!

—দেখছেন, নদীর ওপারে থাকি বলে সুযোগ পেলেই উনি বাড়ী নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েন না। শেবেকের দিকে চেয়ে হেসে বলে পেতর ইভানভিচ। তারপর শহরের বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব সম্পর্কে আরও খানিকটা আলোচনা করে আবার তারা আদালতের প্রসঙ্গে ফিরে আসেন।

ইভান ইলিচের মৃত্যুর ফলে সম্ভাব্য পদ-পরিবর্তন ও পদোন্নতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ছাড়াও এই নিকট পরিচিতের মৃত্যু-সংবাদ স্বভাবতই এদের সকলের মনে এই আত্ম-প্রসাদের ভাব জাগ্রত করে: মরেছে তো অন্যে…আমি তো মরিনি!

সকলেই মনে মনে ভাবে কি অনুভব করে: যাক গে, মারা গেছে তো সে…আমি তো বেঁচে আছি! কিন্তু ইভান ইলিচের অন্তরঙ্গ পরিচিতেরা, মানে তার তথাকথিত বন্ধু-বান্ধব একথা না ভেবে পারল না যে, এইবারে তাদের শেষ-কৃত্যে যোগ দেবার মত বিরক্তিকর সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হবে, আর বিধবার সঙ্গে দেখা করেও শোক-জ্ঞাপন করে আসতে হবে।

ফেদর ভাসিলিভিচ আর পেতর ইভানভিচ তার পরিচিতদের মধ্যে সব চাইতে ঘনিষ্ঠ। আইন পড়ার সময় ইভানভিচ

তার সতীর্থ ছিল। তাছাড়াও নিজেকে সে ইভান ইলিচের কাছে ঋণী বলে মনে করে।

ডিনার খাবার সময় স্ত্রীকে ইভান ইলিচের মৃত্যু-সংবাদ জানায় পেতর ইভানভিচ এবং এইবারে তার ভাইকে এই এলাকায় বদলী করা হয়ত সম্ভব হবে বলেও ইংগিত করে। তারপর প্রাত্যহিকের দিবানিদ্রা বিসর্জন দিয়ে সান্ধ্য বেশবাস পরে গাড়ি করে ইলিচের বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

ফটকের সামনে একখানি জুড়ি-গাড়ি আর খান দুয়েক ভাড়া-গাড়ি ছিল। ক্লোক রাখার আয়নার কাছাকাছি একতলার হল ঘরের দেয়ালে সোনালী চাদর দিয়ে মোড়া শবাধারের একটি ডালা হেলান দেওয়া রয়েছে। চাদরখানি সোনার দড়ি আর সোনার ঝুরি দিয়ে সাজান। আর এই অলংকার আবার ধাতুর গুঁড়ো দিয়ে পালিশ করা হয়েছে। কাল পোশাক-পরা দুটি মহিলা তখন গা থেকে ফার ক্লোক খুলে ফেলছেন। ইভান ইলিচের ভগিনীকে চিনতে পারে পেতর ইভানভিচ; কিন্তু দ্বিতীয়া অপরিচিতা। ইভানভিচের সহকর্মী সোয়ার্জ এই সময় সবে একতলায় নামছিল। কিন্তু পেতর ইভানভিচকে ঢুকতে দেখেই সে থেমে পড়ে এবং পিট পিট করে চায় তার দিকে। যেন বলতে চায়ঃ ইভান ইলিচ সব ভেস্তে দিয়ে গেছেন, কিন্তু তোমার বা আমার মত নয়!

সোয়ার্জের কেতাদুরস্ত গোঁফওয়ালা মুখ আর সান্ধ্য বেশ-বাস পরা ছিপছিপে চেহারার মধ্যে এমন এক চোস্ত গাম্ভীর্য ছিল যা তার হাসিখুশি স্বভাবের পক্ষে নেহাৎ বেমানান, আর এখান-

কার বিশেষ পরিবেশের সঙ্গেও একদম খাপ খাচ্ছিল না। অন্তত পেতর ইভানভিচের তাই মনে হয়েছে।

মহিলাদের আগে আগে যেতে দেয় পেতর ইভানভিচ এবং নিজে সন্তর্পণে উপরতলায় তাদের অনুগমন করে। সোয়ার্জ নীচে নামেনি•••যেখানে ছিল সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে। পেতর ইভানভিচ বুঝতে পারে যে আজকের ব্রিজ খেলার স্থান নির্ণয় করতে চায় সোয়ার্জ। মহিলারা একে একে বিধবার ঘরে চলে যান! গম্ভীরভাবে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সহাস দৃষ্টিতে ইভানভিচ-কে ভুরুর ইশারায় ডানদিকের ঘরটি দেখিয়ে দেয় সোয়ার্জ। শবটি সেই ঘরেই শোয়ান রয়েছে।

ইতি-কর্তব্য সম্পর্কে বিমূঢ় অবস্থায় ঘরে প্রবেশ করে ইভান ইভানভিচ। এমন পরিস্থিতিতে সকলেরই খানিকটা বিমূঢ়তা দেখা দেয়। এইটুকুমাত্র তার জানা ছিল যে এই সব ক্ষেত্রে ক্রশ করা সব দিক থেকে নিরাপদ। কিন্তু ক্রশ করার সময় অভিবাদন করা সমীচীন হবে কিনা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি। কাজেই সে মধ্য-পন্থা অবলম্বন করে। ঘরে ঢুকেই সে ক্রশ করতে আরম্ভ করে এবং নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নোয়ায়। আর সেই সুযোগে হাত ও মাথার ভঙ্গীর ফাঁকে ঘরের অবস্থাটা যথাসম্ভব দেখে নেয়। দুটি যুবক ক্রশ করে বেরিয়ে গেল। পষ্টই বোঝা যায়, এরা বোনপো। একজন আবার হাই স্কুলের ছাত্র। এক বৃদ্ধা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অদ্ভুত ভুরু বাঁকানো এক মহিলা ফিস ফিস করে কি যেন বলছিলেন তার কানে কানে। ফ্রক-কোট-পরা বলবান

দৃঢ়চেতা এক পাদরী চড়াগলায় কি যেন পাঠ করছেন। তার পড়ার ভঙ্গী এমনি দৃঢ়তাব্যঞ্জক যে তার মধ্যে প্রতিবাদের সুযোগ নেই। 'বাটলারের' সহকারী গেরাসিম সন্তর্পণে পেতর ইভানভিচের সামনে এসে মেজেয় কি যেন ছড়িয়ে দেয়। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে পেতর ইভানভিচ সঙ্গে সঙ্গে পচ-ধরা শবের ক্ষীণ দুর্গন্ধ অনুভব করে।

শেষবার ইভান ইলিচকে দেখতে এসে গেরাসিমকে পড়ার ঘরে দেখেছিল ইভান ইভানভিচ। ইভান ইলিচের খুবই প্রিয় পাত্র ছিল গেরাসিম; আর এই লোকটিই তার নার্সের কাজ করত।

শবাধার, পাদরী আর কক্ষটির এক কোণে টেবিলের উপর সাজান ইকনগুলির মাঝামাঝি একটা স্থান লক্ষ্য করে ঈষৎ মাথা নুইয়ে বারংবার ক্রশ করতে থাকে পেতর ইভানভিচ। খানিক বাদে হাতের ভঙ্গী অনেকক্ষণ করা হয়েছে মনে করে সে ক্রশ করা বন্ধ করে এবং একদৃষ্টে শবটির দিকে চেয়ে থাকে।

বিশিষ্ট ভঙ্গীতে কাঠের গুঁড়ির মত শুয়ে আছে মৃত লোকটি। সমস্ত মৃত লোকই অবশ্য এমনিভাবে শোয়। তার অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শবাধারের কুশনের উপর কেটে বসেছে। মাথাটি চিরদিনের মত ভেঙে পড়েছে বালিশের উপর। মোমের মত ফ্যাকাশে হলদে ভুরু আর বিরল-কেশ রগ এমনভাবে উপর দিকে টান হয়ে আছে যা একমাত্র মৃতদের মধ্যেই দেখা যায়। টিকলো নাকের ডগা ঝুলে পড়েছে ওষ্ঠের উপর। পেতর ইভান-ভিচ শেষবার যখন তাকে দেখে গেছে, তার চাইতে অনেক

বদলে গেছে ইভান ইলিচ। আরও শীর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু জীবিতাবস্থার চাইতে তার মুখমণ্ডল স্বভাবতই আরও প্রশান্ত সুন্দর আরও মহিমান্বিত দেখাচ্ছে! এই পরিবর্তন সব মৃতের পক্ষেই স্বাভাবিক। মুখের ব্যঞ্জনা যেন বলছেঃ প্রয়োজন এতদিনে সিদ্ধ হয়েছে, শুধু সিদ্ধ নয়...যথাযথভাবেই সিদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়াও সেই ব্যঞ্জনার মধ্যে জীবিতদের প্রতি সুস্পষ্ট একটা তিরস্কার আর হুঁশিয়ারির ভাব ছিল। পেতর ইভান-ভিচের কাছে এই হুঁশিয়ারি অবান্তর বলে মনে হয়...অন্তত তার সম্পর্কে প্রযোজ্য নয় নিশ্চিত। খানিকটা অস্বস্তি বোধ করে ইভানভিচ। কাজেই আর একবার ক্রুশ করে পেছন ফিরে সে বড্ড চটপট ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। অথচ এই লক্ষ্য পড়বার মত অসৌজন্য সম্পর্কে নিজে সে সম্পূর্ণ অবহিত ছিল।

পা ফাঁক করে লাগোয়া ঘরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল সোয়ার্জ...দুই হাত দিয়ে উঁচু টুপির পেছনটা নাড়াচাড়া করছিল। এই হাসিখুশি চোস্ত পোশাক-পরা পরিপাটি-দুরস্ত ছিমছাম চেহারা দেখে পেতর ইভানভিচের মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে। মনে হল যেন সোয়ার্জ এই সব ঘটনার ঊর্ধ্বে...ফুর্তির হানি ঘটাতে পারে এমন কোন প্রভাবের কাছে বুঝি সে নতি স্বীকার করবে না। তার চোখ যেন বলে দিচ্ছে যে ইভান ইলিচের উদ্দেশ্যে এই উপাসনা-কৃত্যের জন্য দৈনন্দিন আসরের নিয়ম লঙ্ঘন করা অর্থহীন। তার মানে, সেদিন সন্ধ্যায় নতুন তাসের প্যাকেট খুলে তাস ভাঁজা আর টেবিলের উপর খানসামার চারখানা নতুন মোম জ্বেলে দেবার নিয়মের নিশ্চয়ই

কোন বাধা হবে না। অবশ্য এ কথা মনে করবার কোন কারণ নেই যে এই ঘটনা তাদের সান্ধ্য মজলিসের ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। পেতর ইভানভিচ পাশ কাটিয়ে যাবার বেলা এ কথা সে বলতেও দ্বিধা করল না। সোয়ার্জ প্রস্তাব করল যে ফেদর ভাসিলিভিচের বাড়ীতে আজকের খেলার আসর বসান যেতে পারে। কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, সেদিন সন্ধ্যায় ব্রিজ খেলা পেতর ইভানভিচের ভাগ্যে ছিল না। পুরোপুরি কাল পোশাক আর মাথায় লেসের ঘোমটাপরা প্রাসকভিয়া ফেদরভনা এই সময় জনকয়েক মহিলাসহ নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং যে ঘরে শবটি রয়েছে মহিলাদের সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বলেন, এখুনি উপাসনা শুরু হবে, ভেতরে আসুন আপনারা।

মোটা-সোটা বেঁটে স্ত্রীলোক প্রাসকভিয়া ফেদরভনা। শত চেষ্টা করেও মহিলাটি কাঁধ থেকে কোমর অবধি ক্রমাগত মুটিয়ে-যাওয়া রোধ করতে পারেননি। শবাধারের পাশে যে মহিলাটি দাঁড়িয়ে ছিলেন ফেদরভনার ভুরুও তার মত অদ্ভুতভাবে বাঁকানো।

অস্পষ্টভাবে অভিনন্দন করে সোয়ার্জ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। স্পষ্টতই সে আমন্ত্রণ গ্রহণও করল না, আবার প্রত্যাখ্যানও করল না। পেতর ইভানভিচকে দেখতে পেয়ে প্রাসকভিয়া ফেদরভনা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার দিকে এগিয়ে যান। বলেন : জানতাম, আপনি ইভান ইলিচের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন …। ইভানভিচের মুখ থেকে যথোচিত একটি জবাব শোনার আশায় তিনি তার দিকে তাকান। পেতর ইভানভিচ জানত

যে শবের কাছে গিয়ে ক্রশ করা যেমন নিরাপদ কাজ, এবারেও তেমনি তাকে মহিলাটির হাতে চাপ দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হবে : বিশ্বাস করুন……। সুতরাং সামাজিক ভব্যতার রীতি অনুযায়ী এই সব কিছুই সে করে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করে যে সে আর মহিলাটি বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

—আমার সঙ্গে আসুন। উপাসনা শুরু হবার আগে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলে নেব। বিধবা বলেন।—আমায় ধরে নিয়ে চলুন!

পেতর ইভানভিচ বাহু বাড়িয়ে দেয়। সোয়ার্জের পাশ কাটিয়ে উভয়েই ভেতরের ঘরের দিকে চলে যায়। সোয়ার্জ পিটপিট করে সহানুভূতির চোখে তাকায় পেতর ইভানভিচের দিকে। তার কৌতুকোচ্ছল দৃষ্টি বলে : ব্রিজ খেলার দফা শেষ হল। আর একজন খেলোয়াড় যোগাড় করলে আপত্তি করতে পারবে না কিন্তু! ছাড় পেলে এসে যাবে নিশ্চয়ই!

আরও গভীর হতাশাভরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে পেতর ইভানভিচ। সকৃতজ্ঞ প্রাসকভিয়া ফেদরভনা আরও জোরে তার বাহু চেপে ধরেন। ছাপান চাদর দিয়ে আসবাবপত্র ঢাকা মিটমিটে-আলো-জ্বালানো বৈঠকখানায় ঢুকে তারা একখানা টেবিলের পাশে বসেন। মহিলাটি বসেন একটা সোফার উপর, আর পেতর ইভানভিচ বসল একটা নীচু নরম কৌচে। তার চাপে স্প্রিং সংকুচিত হয়ে নীচু হয়ে যায়। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা তাকে আর একটা আসনে বসবার কথা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথাটা তার বর্তমান অবস্থায় সমীচীন হবে না মনে করে

মত পরিবর্তন করেন। কৌচের উপর বসবার সময় পেতর ইভানভিচের মনে পড়েঃ ইভান ইলিচ কত পরিপাটি করে ঘরখানি সাজিয়েছিলেন এবং সবজে পাতাওলা এই গোলাপী চাদর কেনা সম্পর্কে তার পরামর্শ চেয়েছিলেন। ঘরময় আসবাবপত্র সাজান। সোফায় বসতে গিয়ে টেবিলের খোদাই করা কোণে বিধবার কাল শালের লেস আটকে যায়। খুলে দেবার জন্য পেতর ইভানভিচ উঠে পড়ে। তার ভারমুক্ত হয়ে কৌচের স্প্রিংও ফেঁপে উঠে ঠেলা মারে। বিধবা নিজেই শাল খুলবার চেষ্টা করেন; ফলে বেয়াড়া স্প্রিংটা চেপে আবারও বসে পড়ে পেতর ইভানভিচ। আটকানি খুলতে বিধবার খানিকটা বিলম্ব হয়; তাই দেখে আবারও উঠে পড়ে পেতর ইভানভিচ। সঙ্গে সঙ্গে কৌচটা আবারও ফেঁপে কচমচ করে ওঠে। এই সব শেষ হয়ে গেলে ক্যামব্রিকের একখানা ধবধবে রুমাল বার করে মহিলাটি কাঁদতে শুরু করেন। শালের প্রসঙ্গ এবং কৌচের সঙ্গে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা পেতর ইভানভিচের ভাবাবেগ ঠাণ্ডা করে দেয়। বিষণ্ণ গোমড়া মুখে সে চুপ করে বসে থাকে। ইভান ইলিচের বাটলার সকলভ এই বিচ্ছিরি অবস্থায় ব্যাঘাত জন্মায়। সে এসে সংবাদ দেয়ঃ সমাধিক্ষেত্রে প্রাসকাভিয়া ফেদরভনা যে স্থানটি নির্বাচন করেছেন, তার দাম পড়বে দুশো রুবল। মহিলাটি কান্না বন্ধ করেন। অপরাধীর মত অসহায় দৃষ্টিতে ইভানভিচের দিকে চেয়ে ফরাসীতে বলেন, এত দাম দেওয়া তার পক্ষে কষ্টকর। পেতর ইভানভিচ নীরব ভঙ্গীতে পুরোপুরি সায় দেয়।

তখন খানিকটা উদারভাবে ভাঙাগলায় মহিলাটি বলেন ঃ ধূমপান করুন না! তারপর সকলভের দিকে ফিরে কবরের জমির দাম নিয়ে আলোচনা করেন।

সিগ্রেট ধরিয়ে পেতর ইভানভিচ সমাধিক্ষেত্রের বিভিন্ন জমির দাম সম্পর্কে মহিলাটির ছাড়াছাড়া জিজ্ঞাসাবাদ কান পেতে শোনে। শেষ অবধি তিনি একখণ্ড জমি নির্বাচন করেন। এই সবের পর গায়কদল নিয়োগ করা সম্পর্কেও মহিলাটি নির্দ্দেশ দেন। তারপর সকলভ ঘর থেকে চলে যায়।

—সব কিছুই আমি নিজেই দেখাশোনা করি। টেবিলের উপরকার জিনিসগুলো নাড়াচাড়া করে পেতর ইভানভিচকে বলেন মহিলাটি। ইভানভিচের সিগ্রেটের ছাই পড়ে টেবিলটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য করে ছাই ফেলার পাত্রটি বাড়িয়ে দিতে দিতে বলেন ঃ শোকের জন্য সংসারের কাজকর্ম দেখাশোনা করতে পারছি না একথা বলা আমি কপটতা বলে মনে করি। বরং ওর সব কিছু দেখাশোনা করতে পারলে সান্ত্বনা পাই বলব না, তবে আনমনা হতে পারি নিশ্চয়ই।

কান্নার উদ্যোগ করবার জন্য আবারও তিনি রুমাল বার করেন, কিন্তু সহসা যেন নিজেকে সংযত করে গা ঝাঁকুনি দেন এবং শান্তভাবে বলতে শুরু করেন ঃ যাহোক, একটা বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে চাই।

কৌচের স্প্রিংটা চেপে রেখে মাথা নোয়ায় পেতর ইভানভিচ। কিন্তু স্প্রিংটি সঙ্গে সঙ্গে তার নীচে মৃদু মৃদু দুলতে থাকে।

—গত দিন কয়েক খুবই কষ্ট পেয়েছেন !

—তাই কি ? পেতর ইভানভিচ বলে।

—ওঃ ! বেজায় কষ্ট পেয়েছেন। দুচার মিনিট নয়··· ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটানা আর্তনাদ করেছেন। গত দিন তিনেক পলকের জন্যও আর্তনাদ থামেনি। সে আর্তনাদ কানে শোনা যায় না ! কেমন করে যে সইলাম তা নিজেই বুঝে উঠতে পারি না। তিন চারখানা কামরার ওপাশ থেকেও কঁকানি শোনা যেত। ওঃ ! কি কষ্টই যে সইতে হয়েছে !

—সব সময় ওর জ্ঞান ছিল কি ? পেতর ইভানভিচ জিজ্ঞাসা করে।

—ছিল···শেষ মুহূর্ত অবধি ছিল। ফিসফিস করে বলেন তিনি ঃ মরার মিনিট পনর আগে আমাদের সবারই কাছ থেকে বিদায় নেন এবং ভলদিয়াকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলেন।

ইভান ইলিচের সঙ্গে আবাল্য পরিচয় ইভানভিচের। শৈশবে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছে···কৈশোরে একই স্কুলে পড়েছে···তারপর পরিণত বয়সে সহকর্মী হিসাবে কাজ করেছে। অন্তরঙ্গ পরিচিত সেই মানুষটির ক্লেশের কথা শুনে নিজের আর এই মহিলাটির কপটতা সত্ত্বেও সহসা ভয়ে অভিভূত হয়ে পড়ে পেতর ইভানভিচ। আবারও তার চোখের সামনে সেই ভুরু, সেই ওষ্ঠের উপর ঝুলে-পড়া নাক ভেসে ওঠে। নিজের জন্য কেমন ভয় ভয় করে।

মনে মনে ভাবে ঃ পর পর তিনদিন ক্লেশ ভোগের পর মৃত্যু ! সহসা যে কোন সময়ে আমারও এ অবস্থা হতে পারে তো !

পলকের জন্য সে ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু অমনই তার মনে এই প্রচলিত চিন্তা জাগে ঃ সে-অবস্থা হয়েছে ইভান ইলিচের···তার নয়! কেমন করে কথাটা যে মনে এল তা সে নিজেও জানে না। মনে হল, এ অবস্থা তার হবে না···হতে পারে না। আর এই কথা ভাবার অর্থ ঃ বিমর্ষতার কাছে আত্ম সমর্পণ করা! সে কাজ কখনও করা উচিত নয়। সোয়ার্জের ভাব থেকে স্পষ্টই তা বোঝা যায়। এই চিন্তার পর পেতর ইভানভিচ খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করে এবং ইভান ইলিচেব মৃত্যু-সংক্রান্ত খুঁটিনাটি খবর জানতে চায়। যেন মৃত্যুটা শুধু ইভান ইলিচের পক্ষেই একটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা—নিশ্চয়ই তার নিজের পক্ষে নয়!

ইভান ইলিচকে সত্যই যে বিভীষিকাময় দৈহিক ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়ে বিধবাটি আসল কাজের কথা পাড়তে চান। অবশ্য সেই মর্মান্তিক ক্লেশ প্রাসকভিয়া ফেদরভনার স্নায়ুর উপর যে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করেছে, ইভানভিচ শুধু তারই বর্ণনা শুনতে পায়!

—ওঃ! বড় মর্মান্তিক পেতর ইভানভিচ! কত যে মর্মান্তিক তা বলে বোঝান যায় না।

আবারও কাঁদতে শুরু করেন মহিলাটি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তার নাক-ঝাড়া অবধি অপেক্ষা করে পেতর ইভানভিচ। নাক-ঝাড়ার পর মহিলাটি বলেন ঃ বিশ্বাস করুন···। তারপর ফেদরভনা আবারও কথা বলতে শুরু করেন। এইবারে তিনি পেতর ইভানভিচের সঙ্গে আলোচনার আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে

কথা পাড়েন ; অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু উপলক্ষে রাজকোষ থেকে সাহায্য আদায়ের পন্থার কথা জিজ্ঞাসা করেন। কথাটা তিনি এমনভাবে পাড়েন যাতে পেতর ইভানভিচের মনে হয় যেন তিনি তার পেনসন সম্পর্কে পরামর্শ চাইছেন। কিন্তু ইভানভিচ অবিলম্বেই বুঝতে পারে যে পেনসন্ সম্পর্কে সব কিছুই তার জানা···এমনকি তার নিজের চাইতেও মহিলাটি বেশী খোঁজ-খবর রাখেন। ভালভাবেই তিনি জানেন যে স্বামীর মৃত্যুর জন্য রাজকোষ থেকে কতটা তিনি আদায় করতে পারবেন। কিন্তু তার জিজ্ঞাসার অর্থ হচ্ছে, আরও বেশী কিছু আদায় করা সম্ভব কিনা। পেতর ইভানভিচ মনে মনে একটা উপায় বার করার চেষ্টা করে। খানিকক্ষণ চুপ করে ভেবে সৌজন্যের খাতিরে সরকারী কৃপণতার নিন্দা করে জানায় যে অতিরিক্ত কিছু আদায় করা সম্ভব নয় বলেই তার ধারণা। মহিলাটি তখন দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন এবং অতিথিকে বিদায় করে দেবার ভব্য পন্থা বার করবার চেষ্টা করেন। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পেতর ইভানভিচ সিগ্রেট নিভিয়ে ফেলে এবং উঠে দাঁড়িয়ে মহিলাটির করতলে চাপ দিয়ে পাশের ঘরে চলে যায়।

খাবার ঘরে মস্ত বড় একটা ক্লক ছিল। ঘড়িটি ইভান ইলিচের শখের জিনিস। পুরনো দোকান থেকে কিনেছিলেন। এখানে ইভানভিচের সঙ্গে একজন পুরোহিত এবং জন কয়েক পরিচিতের দেখা হয়। উপাসনায় যোগ দেবার উদ্দেশ্যে এসেছে এরা। ইভান ইলিচের মেয়েকে চিনতে পারে ইভানভিচ। প্রিয়দর্শিনী তরুণী। কাল পোশাক পরে এসেছে মেয়েটি। এই

পোশাকে তন্বীকে আরও ছিপছিপে দেখাচ্ছে। মেয়েটির মুখ ব্যঞ্জনা বিষণ্ণ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক···কতকটা ক্ষুব্ধও বলা চলে। এমন ভাবে সে পেতর ইভানভিচকে অভিবাদন জানায় যেন সে অপরাধী। তার পেছনে এক বিত্তবান সুদর্শন যুবক—তদন্ত-কারী ম্যাজিস্ট্রেট। তার মুখভঙ্গীও মেয়েটির মত ক্ষুব্ধ। যুবকটি পেতর ইভানভিচের চেনা···শুনেছে ও নাকি মেয়েটির প্রণয়ী। বিষণ্ণমুখে এদের প্রত্যভিবাদন জানিয়ে শব-গৃহে যাবার মুখে সিঁড়ির তলায় ইভান ইলিচের পুত্রকে দেখতে পায় ইভানভিচ। ছেলেটি স্কুলে পড়ে···দেখতে হুবহু বাপের মত। তাকে দেখে ছোটবেলার ইভান ইলিচের কথা মনে পড়ে। আইন কলেজে একসঙ্গে পড়বার সময় অবিকল এমনি দেখাত তাকে। তের-চোদ্দ বছরের পাকা ছেলের অশ্রুসিক্ত মুখের মতই দেখাচ্ছে তার চোখের-জলে-ভেজা মুখখানা। পেতর ইভানভিচকে দেখে সসঙ্কোচে বিষণ্ণভাবে ভ্রূকুটি করে ওঠে ছেলেটি! ইভানভিচ তাকে সম্ভাষণ জানিয়ে শব-গৃহে ঢুকে যায়। উপাসনা শুরু হয়। মোমের আলো, হা-হুতাশ, ধূপের গন্ধ, চোখের জল আর ফোঁপানিতে ঘরখানি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। মুখ ভার করে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে থাকে পেতর ইভানভিচ। ভুলেও সে মৃতলোকটির দিকে একবার ফিরে তাকায়নি, কিংবা বিষণ্ণতার কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। প্রথমে যারা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, সেও তাদের দলেই ছিল। লাগোয়া ঘরে কোন লোক ছিল না, কিন্তু গেরাসিম লম্বা পা ফেলে শব-গৃহ থেকে বেরিয়ে আসে এবং সবল দৃঢ় হাতে কার

কোইগুলো উলটে-পালটে ফেদর ইভানভিচেরটা বার করে তাকে পরিয়ে দেয়।

—বড়ই দুঃখের ব্যাপার, কি বল গেরাসিম, তাই না? একটা কিছু বলা উচিত বলেই বলে পেতর ইভানভিচ।

—ভগবান যা করেন তাই হবে! একদিন সবাইকেই তো যেতে হবে! দেঁতো হাসি হেসে বলে গেরাসিম। সুন্দর সাদা ঝকঝকে দাঁতওলা স্বাস্থ্যবান চাষী লোকটি। জরুরী কাজে ব্যস্ত লোকের মত চটপট সে সামনের দরজা খুলে দেয় এবং কোচোয়ানকে ডেকে ইভানভিচকে শ্লেগায় চড়তে সাহায্য করে। পরক্ষণেই এমনভাবে লাফ দিয়ে বারান্দার ওঠে যেন পরবর্তী কাজের জন্য দেরি হচ্ছে।

ধূপ-দীপ, মৃতদেহ আর কার্বলিক এসিডের গন্ধের পর এই খোলা হাওয়া পেতর ইভানভিচের ভালই লাগে।

—কোথায় যাব স্যর? কোচোয়ান জিজ্ঞাসা করে।

—এখনও খুব দেরি হয়নি···ফেদর ভাসিলিভিচের ওখানেই যাব।

সেইখানেই যায় ইভানভিচ। ওদের তখন প্রথম 'রাবার' শেষ হয়ে এসেছে। কাজেই দলে ভিড়ে পড়তে অসুবিধা হল না।

নেহাৎ সরল, নিতান্ত আটপৌরে জীবন ইভান ইলিচের ; তাই সে-জীবন বিভীষিকাময়।

ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি···মারা যান পঁয়তাল্লিশ বছরে। তার বাবাও রাজকর্মচারী ছিলেন। পেতরবুর্গের বিভিন্ন সরকারী বিভাগ আর মন্ত্রীদপ্তরে কাজ করে শেষ অবধি তিনি ফালতু অথচ আরামের একটি পদ যোগাড় করে নেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ এই সব কর্মচারী এমন এক কর্ম-জীবনের নজীর সৃষ্টি করেন যে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হলেও দীর্ঘদিন চাকুরির জন্য এদের বরখাস্ত করা সম্ভব হয় না। সরকারী মহল এদের জন্য তখন বিশেষ পদ সৃষ্টি করে থাকে। সেই পদগুলি অর্থহীন হলেও তার মাইনে থাকে ছয় থেকে দশ হাজার রুবল পর্যন্ত। মাইনেটা কাল্পনিক নয় নিশ্চয়ই। আর এই মোটা মাইনে ভোগ করে এরা দীর্ঘ জীবন লাভ করেন।

এই হল প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য আর বিভিন্ন অনাবশ্যক প্রতিষ্ঠানের ফালতু সদস্য ইলিয়া এপিমভিচ গলভিনের আসল পরিচয়।

তিন ছেলে ভদ্রলোকের। ইভান ইলিচ মেজ। বড় ছেলে ভিন্ন বিভাগে বাপের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে। বর্তমানে তার চাকুরি যে অবস্থায় পৌঁছেছে তাতে সেও অনতিবিলম্বেই বাপের মত আরামের চাকুরি পেয়ে যাবে। শ্রম করতে হবে না কিন্তু পারিশ্রমিক মিলবে মোটা। ছোট ছেলের জীবন ব্যর্থ। বিভিন্ন বিভাগে কাজ করে সে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা নষ্ট

করেছে। এখন আছে রেল বিভাগে। বাপ-ভাইয়েরা তার সঙ্গে দেখা করতেও চায় না। বৌদিদের বিরক্তি আরও বেশী। দেখা না করা তবু ভাল, বাধ্য না হলে তার অস্তিত্বের কথাও এরা ভুলে থাকতে চায়। ভগিনীটি বিয়ে করেছে বাপেরই মত ব্যারন গ্রাফ্ নামে পেতরবুর্গের এক অফিসারকে। গোটা পরিবারের মধ্যে আলাদা ধাতের মানুষ ছিলেন ইভান ইলিচ। লোকে তাই বলত অবশ্য। বড় ভাইর মত নিষ্প্রাণ কিংবা কপট মিষ্ট-ভাষীও তিনি নন, আবার ছোট ভাইর মত বেয়াড়াও ছিলেন না। বুদ্ধিমান সদালাপী মার্জিত রুচির প্রাণবন্ত অমায়িক লোক ছিলেন তিনি। ছোট ভাইর সঙ্গেই তিনি আইন কলেজে পড়েছেন; কিন্তু সে পাশ করতে পারেনি। পঞ্চম শ্রেণীতে থাকতেই স্কুল থেকে তাকে বহিষ্কার করে দেয়। ইভান ইলিচ অবশ্য ভালভাবেই পড়াশোনা শেষ করেন। আইনের ছাত্রাবস্থায় যা ছিলেন, বাকী জীবনেও ঠিক সেই মানুষটিই রয়ে গেছেন। যেমন যোগ্য তেমনি হাসিখুশি অমায়িক মিশুক লোক। তবে কর্তব্য বলে যা মনে করতেন সে-বিষয়ে বরাবর কঠোর ছিলেন। আর কর্তব্য সম্পর্কে তার ধারণা কতৃপক্ষীয়দের ধারণার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যেত। বাল্যে বা পরিণত বয়সে কোনদিন তিনি হীন তোষামুদে ছিলেন না। তবে পতঙ্গ যেমন আগুনের শিখার দিকে আকৃষ্ট হয়, তিনিও আবাল্য তেমনি ভাবে উঁচুতলার মানুষের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতেন এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের হালচাল আর দৃষ্টিভঙ্গী রপ্ত করে নিয়েছিলেন। বাল্য বা যৌবনের সমস্ত

উৎসাহ আর আগ্রহ উত্তরজীবনে তার উপর বিশেষ কোন প্রভাব রেখে যেতে পারেনি। ভোগ, শিক্ষা আর অহমিকার কাছে আত্মসমর্পণ করেন ইভান ইলিচ। শেষ অবধি সর্বোচ্চ তলার মানুষের কাছে উদারনীতিক সাজতেন। কিন্তু নিজের সহজাত বুদ্ধি যেটুকু এগোন সমীচীন বলে প্রতিবারেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছে সেই সীমা তিনি কখনও লঙ্ঘন করেননি।

স্কুলে এমন কতগুলো কাজ তিনি করেছেন আগে যা অতি জঘন্য বলে মনে হয়েছে। তখন এজন্য নিজের উপর বিরক্ত হত। কিন্তু পরিণত বয়সে গণ্যমান্য লোকেদের যখন সেই-সব কাজ করতে দেখেছেন, যখন বুঝতে পেরেছেন যে সেই কাজ করা তারা গর্হিত বলেও মনে করে না, তখন তাদের ঠিক সমর্থন করতে পারেননি। তবে হয় তাদের কথা মন থেকে পুরোপুরি মুছে ফেলেছেন, না-হয় স্মরণ করতে চাননি।

আইন কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি নিয়ে তিনি সিভিল সার্ভিসের দশম পর্যায়ে চাকরি লাভ করেন। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তর কেনার টাকাটা বাবাই দিলেন। শারমারের অভিজাত দরজির দোকানে পোশাকের অর্ডার দিলেন ইভান ইলিচ। ঘড়ির চেনে ঝুলালেন নামাঙ্কিত এক মেডেল।... অধ্যাপক এবং কলেজের পৃষ্ঠপোষক প্রিন্সের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। ডোনসের অভিজাত রেস্তোঁরায় এক ভোজের আয়োজন করে সতীর্থেরা তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানায়। তারপর সেরা দোকান থেকে কেনা জামা-পোশাক, বেশবাস, কামাবার আর প্রসাধনের জন্য হরেক রকম জিনিসপত্তর এবং রাগ কিনে

তিনি দূরান্তের এক প্রদেশের অভিমুখে রওনা হলেন। বাপের প্রভাবে লাট-দপ্তরে 'বিশেষ কাজে' নিযুক্ত হলেন ইভান ইলিচ।

অনতিবিলম্বেই চাকরিস্থলে ইভান ইলিচ এক সহজ শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেন। আইন কলেজে পড়বার সময়েও এই কৃতিত্ব তিনি দেখিয়েছেন। ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সরকারী কর্তব্য করে যান। ফলে কর্মজীবনে উন্নতির পথও পরিষ্কার হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিলাস-ব্যসন থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখেননি। মাঝে মাঝে মফঃস্বল সফরে যেতেন এবং সেখানে উপরওলা আর নিম্নপদস্থদের সঙ্গে নিজের পদোচিত সুষ্ঠু আচরণ করেছেন। যে যে কাজের ভার তার উপর অর্পণ করা হয়েছে, এমন অবিচল সততার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সেই কর্তব্য তিনি করেছেন যে নিজে তার জন্য গর্ববোধ না করে পারতেন না।

তরুণ বয়স এবং খেলো বিলাস-ব্যসনের প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও সরকারী কাজে তিনি মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর, নিয়মনিষ্ঠ—এমন কি বেশ খানিকটা কঠোর ছিলেন বলা যায়। কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে বেশ সদালাপী সুরসিক এবং অমায়িক ছিলেন। এ ব্যাপারে তার আচার-আচরণ কখনও মার্জিত ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করেনি। স্বয়ং লাট সাহেব এবং লাট-পত্নী পর্যন্ত এজন্য তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন। তাকে এরা নিজেদের পরিবারভুক্ত বলেই গণ্য করতেন।

এখানে এক মহিলার সঙ্গে কিছুদিন তার মন-দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার চলে। মহিলাটিই এই মার্জিত তরুণ আইন-

জীবীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহিলাদের এক টুপিওলাও জড়িত ছিল এই ব্যাপারে। তাছাড়া লাটসাহেবের পার্শ্বচরদের সঙ্গেও মাঝে মাঝে পান-ভোজনোৎসব চলত। রাত্রির খাওয়া-দাওয়ার পর কখন কখন তাকে সন্দেহজনক পাড়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছে। এ ছাড়া বড় কর্তা, এমন কি তার স্ত্রীর জন্যও দু চারটে হীন কাজ করতে না হয়েছে এমন নয়। তবু এই সব কিছু এমন সুরুচিসম্পন্ন মার্জিতভাবে করা হয়েছে যে কোন কুৎসিত নামেই তাকে অভিহিত করা যায় না। এর সব কিছুই একটা ফরাসী প্রবাদবাক্যের আওতায় পড়ে: বয়সকালে কিছু দোষ ত্রুটি থাকবেই। এর সব কিছু করা হয়েছে পরিচ্ছন্ন মনে, গায়ে বিন্দুমাত্র নোংরা না লাগিয়ে আর ফরাসী বুলি আউড়ে, এবং সর্বোপরি সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের সহযোগে। এ কাজ তাই গণ্যমান্যদের সমর্থনপুষ্ট।

এইভাবেই ইভান ইলিচের পাঁচ বছরের চাকরি-জীবন কেটে যায়। তারপর তার কর্মজীবনে পরিবর্তন আসে। নতুন বিচার-ব্যবস্থা পত্তন হল এ সময়ে। বিচার ব্যবস্থার এই সংস্কার কার্যকরী করার জন্য নতুন লোকের প্রয়োজন। ইভান ইলিচ এই নতুন লোকের একজন মনোনীত হলেন। তাকে বিচারক ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাওয়া হয়। ভিন্ন প্রদেশে হলেও এই পদে তিনি গ্রহণ করলেন। পুরনো সম্পর্ক ছিন্ন করে তাই তাকে নতুন সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। যাবার আগে বন্ধু-বান্ধবেরা বিদায় সংবর্ধনা জানাল। সবাই মিলে এক সাথে ফটো তোলা হল একখানা এবং ইভান ইলিচ একটা রূপোর

সিগ্রেট-কেস উপহার পেলেন। তারপর তিনি নতুন পদে যোগ দিতে গেলেন।

বিচারক হিসাবে ইভান ইলিচ যেমন উপযুক্ত তেমনি ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তার আচরণও ছিল নেহাৎ ভদ্র। সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। তাছাড়া সরকারী কর্তব্য থেকে নিজের ব্যক্তিগত জীবন বিচ্ছিন্ন রাখতেও তিনি জানতেন। স্পেশাল অফিসার থাকাকালেও এই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কিন্তু বিচারক হিসাবে তার এখানকার কর্তব্য আগেকার কাজের চাইতে অনেক বেশী আকর্ষণীয়, ঢের উৎসাহজনক। আগেকার চাকরিতে শারমারের তৈরি উর্দি পরে আবেদনকারী আর লাটসাহেবের দর্শনপ্রার্থী অফিসারদের ভিড়ের মধ্য দিয়ে গটমট করে হেঁটে যাবার মধ্যে অবশ্যই আনন্দ ছিল। হাঁ-করে উৎসুক জনতা দেখত যে সহজ সচ্ছন্দভাবে হেঁটে তিনি কর্তার নিভৃত কক্ষে ঢুকে যেতেন এবং তার সঙ্গে বসে চা কি সিগ্রেট খেতেন। কিন্তু খুব বেশী লোক এই সময়ে তার উপর নির্ভরশীল ছিল না। শুধু পুলিস অফিসার, আর বিশেষ কাজে সফরে বেরুলে বিশেষ বিশেষ ধর্ম-মতাবলম্বীরাই তার উপর নির্ভর করত। তবে এদের সঙ্গে তিনি ভদ্র ব্যবহার করতেন। প্রায় সাথীর মত আচরণ করতেন বলতে গেলে। হয়ত তাদের বুঝিয়ে দিতেন যে দমন করার ক্ষমতা সত্ত্বেও সরল বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করছেন। তবে এই রকম খুব সামান্য লোকই ছিল তখন। কিন্তু এখন ইভান ইলিচের মনে হয়ঃ বিচারক হিসাবে পদমর্যাদা নির্বিশেষে সমস্ত লোক তার অধীন। একটা শিরোনামা দিয়ে এক টুকরো

কাগজের উপর কয়েকটি ছত্র যদি তিনি লিখে দেন তবে যে কোন মানী কি আত্মতুষ্ট লোককে অভিযুক্ত কি সাক্ষী হিসাবে তার সামনে হাজির করা হবে। তিনি যদি বসতে না দেন তো তাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দিতে হবে। ক্ষমতার অপব্যবহার কোনদিন তিনি করেননি। বরং ক্ষমতার প্রয়োগ বরাবর মোলায়েম করবার চেষ্টা করেছেন। তবু তিনি যে ক্ষমতার অধিকারী এই অনুভূতি আর সেই ক্ষমতার প্রয়োগ মোলায়েম করার সম্ভাব্যতা তার কর্মজীবনের প্রধানতম আকর্ষণ। নিজের কাজে, 'বিশেষত জেরা-জবানবন্দীর ব্যাপারে অচিরেই তিনি এমন এক পন্থা অবলম্বন করেন যাতে মামলার আইন সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে অসংলগ্ন সমস্ত বিচার-বিবেচনা অবান্তর হয়ে পড়ত। তার ফলে নিতান্ত জটিল মামলাও কাগজে-কলমে শুধু আইনের ছকে-বাঁধা খসড়ার রূপ পেত। তার সঙ্গে কোথাও তিনি নিজের মতামত যুক্ত করতেন না। কিন্তু এই ব্যাপারে কখনও তিনি প্রতিটি আনুষ্ঠানিক রীতি প্রতিপালনে ভুল করেননি। কাজটি সম্পূর্ণ নতুন ; আর ১৮৬৪ সালের আইন (*) প্রথম যারা কার্যকরী করেন ইভান ইলিচ তাদের অন্যতম।

নতুন শহরে বিচারকের পদ পেয়ে তিনি নতুন সম্পর্ক, নতুনতর পরিচয় গড়ে তোলেন। সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তির উপর গড়ে তোলেন নিজের জীবন। তাছাড়া তার মনোভাবও

(*) ১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথা লোপ করার পর রাশিয়ায় বিচার-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়।

কতকটা বদলে যায়। প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের সংস্রব থেকে সসম্ভ্রমে নিজেকে কতকটা বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন আর মেলা-মেশা করতেন শহরের বাছাই করা আইনজীবী আর বিত্তবান ভদ্রজনের সঙ্গে। সরকার সম্পর্কে ঈষৎ অসন্তোষের ভাবও প্রকাশ করতেন। কথাবার্তার ধরন ছিল উদারনীতি-গন্ধী আর বিদগ্ধ নাগরিক জীবনের সমর্থক। এই সঙ্গে প্রসাধনের পরি-পাটি বিন্দুমাত্র লাঘব না করে তিনি কামানো বন্ধ করেন এবং গালে স্বাভাবিক ভাবে দাড়ি গজাতে দেন।

এই নতুন শহরে বেশ সুখে-শান্তিতে বসবাস করেন ইভান ইলিচ। এখানকার উপরতলার মানুষ লাটসাহেবের বিরোধী-পক্ষের অনুরাগী। তবু ইভান ইলিচের প্রতি তারা বন্ধুভাবাপন্ন। তার মাইনেও বেশ মোটা। কাজেই তিনি বিস্তি খেলা শুরু করেন। এ খেলায় তিনি কম আনন্দ পেতেন না। তাস খেলায় বেশ ওস্তাদ ছিলেন তিনি। তাছাড়া খেলতেনও খোসমেজাজে; আর ঠিকঠাক হিসাবও করতে পারতেন চটপট। কাজেই প্রায়শই তার জিত হত।

বছর দুয়েক এখানে বসবাস করার পর তিনি ভাবী স্ত্রী প্রাসকভিয়া ফেদরভনা মিখেলের সঙ্গে পরিচিত হন। সমাজের যে মহলে তিনি মেলামেশা করতেন, প্রাসকভিয়া ফেদরভনা সেখানকার মেয়েমহলের সেরা মেয়ে। সব চাইতে প্রিয়দর্শিনী, সুচতুরা আর বুদ্ধিমতী। সরকারী কাজের চাপের মধ্যে আমোদ-প্রমোদের যতটুকু ফুরসৎ পাওয়া যেত তারই ফাঁকে প্রাসকভিয়ার সঙ্গে তিনি হালকা মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলেন।

স্পেশাল অফিসারের পদে নিযুক্ত থাকার সময় প্রায়শ তাকে নাচতে হত। কিন্তু এখন বিচারক হিসাবে নাচা না-নাচা তার ইচ্ছাধীন। এখন কোন সময় যদি নাচতেন তো এই কথাই হয়ত প্রতিপন্ন করতে চাইতেন যে তিনি সংস্কৃত নতুন শাসন ব্যবস্থার অধীনে চাকরি করছেন এবং সরকারী পদমর্যাদার দিক থেকে পঞ্চম পর্যায়ে উন্নীত হয়েছেন। তবে নাচের আসরে অধিকাংশ লোকের চাইতে ভাল নাচতে পারতেন ইভান ইলিচ। এইভাবে কোন কোন সান্ধ্য মজলিসের শেষে মাঝে মাঝে তিনি প্রাসকভিয়া ফেদরভনার সঙ্গে নাচতেন। আর এই নাচের সময়েই তরুণীকে তিনি মুগ্ধ করেন।

প্রাসকভিয়া তার প্রেমে পড়ে যায়। প্রথম দিকে বিয়ে করার কোন সুস্পষ্ট অভিপ্রায় ইভান ইলিচের ছিল না। কিন্তু মেয়েটি প্রেমে পড়েছে বুঝে মনে মনে ভাবেন: সত্যিই তো, বিয়ে করবই না বা কেন ?

সদ্বংশের মেয়ে প্রাসকভিয়া ফেদরভনা। দেখতেও মন্দ নয়। তাছাড়া কিছু সম্পত্তিও ছিল। ইভান ইলিচ অবিশ্যি এর চাইতে ভাল স্ত্রী-লাভের আশা করতে পারতেন। কিন্তু এই সম্বন্ধও তো মন্দ নয়! নিজে মোটা মাইনে পান। প্রাসকভিয়ার সম্পত্তির 'আয়ও তার বেতনের সমান হবে বলে মনে হয়। ভাল ভাল ঘরের সঙ্গে কুটুম্বিতাও আছে। এ ছাড়া তরুণীর স্বভাবটি যেমন মধুর তেমনি মিষ্টি। আচার-আচরণ পুরোপুরি মার্জিত শিষ্টাচার সঙ্গত। কিন্তু প্রেমে পড়ে কিংবা জীবন সম্পর্কে প্রাসকভিয়ার ধারণা তার সমধর্মী বলে ইভান

ইলিচ তাকে বিয়ে করেছেন, একথা বলা যায় না। আবার এও বলা যায় না যে বন্ধু-বান্ধব এই সম্বন্ধ অনুমোদন করে বলেই তিনি বিয়ে করেছেন। তবে দুটি জিনিস তার সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে : বিবাহে তিনি ব্যক্তিগত সন্তোষ লাভ করেন আর সেই সঙ্গে তার উপরওলা সহকর্মীরা তার বিয়ে-করা পুরোপুরি সমর্থন করেন।

কাজেই ইভান ইলিচের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের উদযোগ-আয়োজন, নতুন আসবাবপত্র, নতুন বাসনপত্তর, নতুন বেশবাস আর অনুরাগ রঞ্জিত যুগল-জীবনের সূচনা প্রথমে মধুময় লাগে। এই শুভ আরম্ভ থেকে ইভান ইলিচের মনে হয়, বিবাহিত জীবন তার আগেকার সহজ স্বচ্ছন্দ সামাজিক শিষ্টাচার-সম্মত আরাম-আয়াসের ভদ্র জীবন-ধারার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে না। বরং হয়ত তার উন্নতিসাধন করবে। তার কাছে সেইটেই স্বাভাবিক বলে মনে হয়েছে। স্ত্রী অন্তঃস্বত্ত্বা না হওয়া অবধি এই মনোভাবই ছিল। কিন্তু সে গর্ভবতী হবার প্রথম দু-এক মাসের মধ্যেই নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন এক অস্বস্তিকর নিরুৎসাহ-ভরা অশোভন পরিস্থিতি দেখা যায়। অথচ এই অবস্থা থেকে অব্যাহতি পাবার কোন উপায় ছিল না।

তখন ইভান ইলিচের মনে হয়েছে, গৃহিণী যেন অকারণে তাদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। মহিলাটি অকারণে কৌতুহলে ভাব দেখাত, সব কিছুতে দোষ ধরত আর মাঝে মাঝে চটেমটে অভদ্র অশোভন চেঁচামেচি

করে বসত। তাছাড়াও সে আশা করত যে স্বামী অনন্যমনা হয়ে শুধু তার দিকেই নজর দেবে।

উপেক্ষা করে ইলিচ প্রথম এই অস্বস্তিকর অবস্থা এড়াতে চেয়েছেন। ভেবেছেন এতদিনকার সরল শিষ্টাচার সম্মত জীবনধারা বজায় রাখতে পারলে এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। তাই স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজের প্রতি উপেক্ষার ভাব দেখিয়ে তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন-যাপন করে গেছেন—তাস খেলার জন্য বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন নিজের বাড়ীতে আবার নিজেও কখন কখন ক্লাবে কি বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় গিয়ে সন্ধ্যা কাটিয়ে এসেছেন।

কিন্তু স্ত্রী অশিষ্টভাষায় জোরালভাবে তাকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিত। এবং সেই থেকে যখনই তিনি তার দাবী-দাওয়া পূরণ না করতেন, তখনই এমন কড়াভাবে ঝগড়া করত যে ইভান ইলিচ হার স্বীকার না করা অবধি কোনমতেই তার জিদ নিরস্ত করা যেত না। তার মানে, তাকে বাড়ী থাকতে হত এবং বাধ্য হয়ে স্ত্রীর মতই বিরক্তিবোধ করতে হত। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে ইভান ইলিচ শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। শেষ অবধি তিনি উপলব্ধি করলেন: বিয়ে করে, অন্তত প্রাসক-ভিয়া ফেদরভনার মত মেয়েকে বিয়ে করে জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আশা করা বৃথা; এ ধরনের বিবাহ স্বাচ্ছন্দ্যভরা ভদ্র জীবনে প্রায়শ ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কাজেই অবশ্যই তাকে এই হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করতে হবে। বস্তুত তার পথ বার করবার চেষ্টাও করলেন। একমাত্র তার সরকারী কর্তব্যের

বিরুদ্ধেই প্রাসকভিয়া ফেদরভনা নীরব। তাই সরকারী কর্তব্য আর সেই সংক্রান্ত কাজ-কর্মের সাহায্যে নিজের স্বাধীনতা লাভের জন্য স্ত্রীর বিরোধিতা শুরু করলেন ইভান ইলিচ।

সন্তান জন্মাবার পর নবজাতককে খাওয়াবার চেষ্টা আর তার নানাবিধ অসুবিধা, সন্তান ও জননীর খাঁটি কি মানসিক অসুখ-বিসুখের অনুযোগ নতুন ঝমেলা সৃষ্টি করে। সব ব্যাপারেই ইভান ইলিচের সহানুভূতি দাবী করা হয়, অথচ নিজে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই অবস্থায় পারিবারিক পরিবেশের বাইরে সময় কাটাবার প্রয়োজন আরও জরুরী হয়ে ওঠে।

স্ত্রীর স্বভাব যতই খিটখিটে আর কোঁদুলে হয়ে ওঠে ইভান ইলিচও ততই সরকারী কাজে ডুবে থাকার চেষ্টা করেন। ফলে চাকরির প্রতি টান বেড়ে যায় এবং আগের চাইতেও তিনি উচ্চাভিলাষী হয়ে ওঠেন।

বিয়ের বছর খানেকের মধ্যেই ইভান ইলিচ উপলব্ধি করলেন যে বিবাহ প্রকৃতই বড় জটিল এবং কঠিন জিনিস। অবশ্য তার মধ্যে খানিকটা আরাম যে নেই তাও নয়, তবু সামাজিক রীতি-সম্মত ভদ্র জীবনযাপন করতে হলে চাকরি-জীবনের মতই এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট একটা মনোভাব অবলম্বন করা আবশ্যক।

বিবাহিত জীবন সম্পর্কে এমনি একটা মনোভাবই অবলম্বন করলেন ইভান ইলিচ। সংসার থেকে মাত্র গুটি-কয়েক সুবিধাই তিনি চাইতেন: বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার

সুযোগ, গৃহিণী আর শয্যা। এর সব কিছুই তিনি পেতে পারেন। তাছাড়া সর্বোপরি চাই জনমত সমর্থিত শিষ্টাচারের বাহিক্য রূপ। বাকী আর সব কিছুর জন্য তিনি খেলো আমোদ-প্রমোদ আর ভব্যতার খোঁজ করতেন। এবং তাই পেলে পরম তৃপ্তিবোধ করতেন। কিন্তু কোথাও যদি বিরোধিতা আর ঝগড়াটেপনার সম্মুখীন হতেন তো অমনিই সরকারী কাজের বেড়া-দেওয়া আলাদা জগতের মধ্যে আত্ম-গোপন করে থকেতেন আর তাতে আত্মতৃপ্তিও লাভ করতেন।

সুযোগ্য অফিসার হিসাবে খ্যাতি ছিল ইভান ইলিচের। তিন বছর পরে তাকে সহকারী সরকারী কৌঁসুলীর পদ দেওয়া হয়। এই নতুন কর্তব্য, তার গুরুত্ব, খুশিমত যে কোন লোককে সোপর্দ্দ ও কারারুদ্ধ করার সম্ভাব্যতা, তার বক্তৃতার বহুল প্রচার আর এই সব ব্যাপারে কৃতকার্যতা পদটি আরও লোভনীয় করে তোলে।

আরও সন্তান জন্মায়। গৃহিণী ক্রমেই বেশী খিটখিটে, বেশী ঝগড়াটে হয়ে ওঠেন। কিন্তু পারিবারিক জীবন সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী থাকায় তার অনুযোগ বা গজগজানি ইভান ইলিচকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এই শহরে সাত বছর চাকরি করার পর সরকারী কৌঁসুলী হিসাবে তাকে ভিন্ন প্রদেশে বদলী করা হয়। সপরিবারে উঠে গেলেন ইভান ইলিচ ; কিন্তু টাকার বড় অনটন পড়ে। তাছাড়া নতুন জায়গা স্ত্রীর পছন্দ হল না। মাইনে আরও বাড়ল বটে, কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গেল তার চাইতেও বেশী।

ছুটি সন্তান আবার মারা যায় ; ফলে পারিবাবিক জীবন আরও অস্বস্তিকর হয়ে ওঠে।

নতুন বাসায় যে কোন অসুবিধা ঘটলেই তার জন্য স্বামীকে দোষ দিতেন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা। স্বামী-স্ত্রীর অধিকাংশ আলাপ, বিশেষত সে-আলাপ যদি ছেলে-মেয়ের শিক্ষা-প্রসঙ্গে হত তো তার খেই ধরে অনিবার্যভাবে তাদের পুরনো ঝগড়ার প্রসঙ্গ উঠত ; আর সেই কলহ আবারও যে-কোন মুহূর্তে দপ করে জ্বলে উঠতে পারত। বিজুলি চমকের মত কদাচিত আগেকার সেই মধুময় যুগলজীবন দেখা দিত বটে, কিন্তু দীর্ঘ-স্থায়ী হতে পারত না। ক্ষণিকের এই অভিজ্ঞতা যেন ছোট ছোট দ্বীপের মত। পলকের জন্য এখানে নোঙ্গর ফেলে আবার তারা ছদ্ম বিরোধিতার সংসার-সমুদ্রে পৃথকভাবে পাড়ি দিতেন। ইভান ইলিচ যদি ভাবতেন যে এই অবস্থা চলা উচিত নয় তাহলে অবিশ্যি এই নিঃসঙ্গতা তাকে ব্যথা দিত। কিন্তু এই পরিস্থিতি তিনি স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন। এমনকি, তার কাছে এইটেই সাংসারিক জীবনের চরম পরিণতি। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি থেকে নিজেকে যতটা সম্ভব মুক্ত রাখা আর সেগুলোকে একটা ভব্য উপেক্ষণীয় রূপ দেওয়া তার সাংসারিক জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হয়ে পড়ে। পরিবারের সঙ্গে যথাসম্ভব কম সময় কাটিয়ে তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতেন। বাধ্য হয়ে যদি কোন সময় বাড়ী থাকতে হত তো বাইরের দু-একজনকে সঙ্গে রেখে আত্মরক্ষা করতেন। আসল কথা হচ্ছে, সরকারী কাজ প্রচুর থাকত। এই চাকরি-

জীবনকে কেন্দ্র করেই তার ব্যক্তিগত জীবন আবর্তিত হত। আর এই সরকারী কাজের মধ্যে নিজেকে তিনি ডুবিয়ে রাখতে পারতেন। যাকে খুশি ধ্বংস করে দিতে পারি—নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে এই সচেতনতা, পদমর্যাদার গুরুত্ব, এমনকি আদালতে ঢুকবার সময় তার চাল-চলনের কায়দা কিংবা উপরওলা কি অধস্তন কর্মচারিদেব সঙ্গে সুগম্ভীর আলাপ আর সর্বোপরি সুষ্ঠুভাবে মামলা পরিচালনের কৃতিত্বে তিনি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এর সঙ্গে ব্রিজ খেলা, নেমতন্ন আর সহকর্মিদের সঙ্গে খোস-গল্প নিয়েই তো তার জীবন। ইভান ইলিচ যা চেয়েছিলেন, এই সব কিছু মিলিয়ে বেশ আরামে ঠিক সেই-ভাবেই তার জীবন কেটে যায়।

আরও সাত বছর চলে এইভাবে। বড় মেয়েটির বয়স তখন ষোল। আর একটি সন্তানও মারা যায়। একটি মাত্র ছেলে তখন বেঁচে। স্কুলে পড়ে। তাকে নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে বিরোধের অন্ত নেই। ইভান ইলিচ তাকে আইন পড়াতে চান। কিন্তু তার বিরোধিতা করার জন্যই যেন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা ছেলেকে হাই স্কুলে পাঠালেন। মেয়েটি ঘরে বসে লেখা-পড়া শেখে। শিক্ষাও ভালই হয়। ছেলের শিক্ষাও মন্দ হল না।

বিয়ের পর এইভাবেই সতের বছর কেটে যায়। ইভান ইলিচ তখন বহুদিনের সরকারী কৌঁসুলী। ভাল একটা পদলাভের আশায় তিনি কয়েকটি বদলীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় এক অপ্রত্যাশিত অস্বস্তিকর ঘটনা তার শান্তিময় জীবনধারা ওলট-পালট করে দিয়ে যায়। তিনি আশা করছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয় আছে এমনি কোন শহরে তাকে প্রধান বিচারক করে বদলী করা হবে। কিন্তু যেভাবেই, হোক হ্যাপে তাকে ডিঙিয়ে পদটি পায়। ইভান ইলিচ বেদম চটে যান। হ্যাপেকে ভৎর্সনা করেন। এমনকি, হ্যাপে এবং তার নিজের উপরওলার সঙ্গে ঝগড়াও করে বসেন। উপরওয়ালা এতে অসন্তুষ্ট হন। নতুন নিয়োগের সময় তার দাবী ফের উপেক্ষিত হল।

এ ১৮৮০ সালের কথা। বছরটি ইভান ইলিচের জীবনের কঠোরতম সময়। এই সময়েই স্পষ্ট ধরা পড়ে যে মাইনেতে সাংসারিক ব্যয় চলে না, আর কর্তৃপক্ষের কাছেও তিনি উপেক্ষিত। শুধু তাই নয়, নিজে যাকে নিষ্ঠুরতম অবিচার বলে মনে করতেন, অপরের দৃষ্টিতে তা অতি সাধারণ ঘটনা বলে গণ্য হত। এমনকি, তার বাবাও এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করেননি। ইভান ইলিচের মনে হত যেন সবাই তাকে পরিত্যাগ করেছে। সবাই যেন তার বাৎসরিক সাড়ে তিন হাজার রুবল মাইনের চাকরিকে নিতান্ত স্বাভাবিক, এমনকি সৌভাগ্যের লক্ষণ বলে জ্ঞান করে। নিজের প্রতি অবিচারের সচেতনতা, স্ত্রীর ক্ষান্তিহীন অনুযোগ

আর আয়ের অতিরিক্ত ব্যয়ের দরুন ধার-দেনার ফলে একলা তিনিই জানতেন যে তার সাংসারিক অবস্থা আদৌ স্বাভাবিক নয়।

*   *   *   *

টাকা বাঁচাবার জন্য সেবার গ্রীষ্মকালে ছুটি নিয়ে তিনি সস্ত্রীক শালার মফঃস্বলের বাড়ীতে চলে যান।

এই গ্রামাঞ্চলে কর্মহীনতার মধ্যেই তিনি প্রথম অবসাদের লক্ষণ টের পান। শুধু অবসাদ নয়, দুর্বহ এক বিষণ্নতা যেন তাকে পেয়ে বসে। মনে হল, এভাবে বসবাস করা চলে না……জোরাল একটা কিছু করা আবশ্যক।

একদিন গোটা রাত তিনি বারান্দায় পায়চারি করে কাটিয়ে দেন। ঠিক করলেন, পেতরবুর্গ গিয়ে তদবির-তদারক করে ভিন্ন মন্ত্রীদপ্তরে বদলীর ব্যবস্থা করবেন। যারা তার কদর বোঝেনি এতে তাদের গালেও ভালভাবে চড় মারা হবে।

গৃহিণী এবং শালার নিষেধ সত্ত্বেও পরদিনই তিনি পেতর-বুর্গ রওনা হলেন। রাজধানী যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য বছরে পাঁচ হাজার রুবল মাইনের একটি চাকরি আদায় করা। বিশেষ কোন দপ্তর, কাজ বা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি তার আকর্ষণ ছিল না। তার চাই পাঁচ হাজার রুবল মাইনের এক চাকরি। সে চাকরি শাসন বিভাগে হোক, ব্যাঙ্কে হোক, রেল বিভাগে হোক, সাম্রাজ্ঞী মারিয়ার কোন প্রতিষ্ঠানে হোক, এমনকি শুল্ক-বিভাগে হলেও তার আপত্তি ছিল না। পাঁচ হাজার রুবল মাইনের চাকরি পেলেই হল। যে মন্ত্রীদপ্তর তার

যোগ্যতার কদর করেনি সেখানে ছাড়া অপর যে কোন দপ্তরে হোক তাতেই তিনি খুশী।

ইভান ইলিচের এই তল্লাস অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করে। এফ, আই, ইলিন নামে তার এক পরিচিত কুরস্কে প্রথম শ্রেণীর কামরায় ওঠেন। ইভান ইলিচের পাশাপাশি বসে তিনি জানান, কুরস্কের গভর্ণর সদ্য এক তার পেয়েছেন, তাতে জানান হয়েছে যে মন্ত্রী-দপ্তরে পরিবর্তন আসন্ন এবং ইভান সেমিনভিচ তার ফলে পেতর ইভানভিচকে অতিক্রম করে যাবেন।

রাশিয়ার পক্ষে এ পরিবর্তনের তাৎপর্য ছাড়াও ইভান ইলিচের পক্ষে এর গুরুত্ব অসীম। পেতর ইভানভিচের মত নতুন লোক যদি পুরোধায় আসে তাহলে তার বন্ধু জাকার ইভানভিচেরও পদোন্নতি অনিবার্য। ইভান ইলিচের পক্ষে এই সম্ভাবনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। জাকার ইভানভিচ শুধু তার সহকর্মীই নয়, বন্ধুও বটে।

মস্কোতে সংবাদটি পাকাপাকিভাবে জানা গেল। পেতরবুর্গে পৌঁছে জাকার ইভানভিচের সঙ্গে দেখা করেন ইভান ইলিচ। জাকার তাকে সুনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেন যে সাবেক বিচার বিভাগেই তিনি অভীষ্ট পদ পাবেন।

সপ্তাহখানেক পরে স্ত্রীর কাছে তার করেন ইভান ইলিচ: জাকার এখন মিলারের স্থলাধিষ্ঠিত। রিপোর্ট দাখিল করলেই পদ পেয়ে যাব।

উপরতলার লোক বদলীর ফলে বিচার বিভাগেই নতুন পদ পেয়ে গেলেন ইভান ইলিচ। এতে তিনি বছরে পাঁচ হাজার রুবল মাইনে আর বাড়ী বদলের খরচ বাবদ এককালীন সাড়ে তিন হাজার রুবল তো পেলেনই, তাছাড়াও নতুন পদ তাকে সাবেক সহকর্মীদের চাইতে দুই ধাপ উপরে তুলে দেয়। গোটা বিভাগ আর সাবেক শত্রুদের সম্পর্কে তার সমস্ত বিদ্বেষ লোপ পেল। ইভান ইলিচ এখন পুরোপুরি সুখী।

সন্তুষ্টচিত্তে আর প্রসন্নমনে তিনি মফঃস্বলের বাড়ীতে ফিরে এলেন। এতটা প্রসন্ন তিনি বহুদিন হতে পারেননি। প্রাসকভিয়া ফেদরভনাও কতকটা প্রসন্না হলেন। স্বামী-স্ত্রীতে আবার কিছুদিনের মত আপস-রফা হল। পেতরবুর্গে সবারই কাছ থেকে কত যে আদর আপ্যায়ণ পাওয়া গেছে, শত্রুরা মুখ ভোঁতা করে কেমন করে তার তোয়াজ করেছে, তার নতুন পদলাভে কতটা ঈর্ষ্যান্বিত তারা হয়েছে আর রাজধানীর সবাই তাকে কি পছন্দই যে করেছে, সবিস্তারে স্ত্রীকে তার গল্প শোনালেন ইভান ইলিচ।

প্রাসকভিয়া ফেদরভনা সব কিছু মন দিয়ে শুনলেন। মনে হল বিশ্বাসও করলেন। কোন প্রতিবাদ তিনি করলেন না; শুধু নতুন শহরে গিয়ে কেমন করে সংসার পাতবেন তার পরিকল্পনা শোনালেন। ইভান ইলিচ যখন দেখলেন যে স্ত্রীর পরিকল্পনা তার পরিকল্পনার সামিল, স্বামী-স্ত্রীতে তখন মতের মিল হল। খানিকটা হোঁচট খেয়ে এতদিন

পরে আবার তার জীবন স্বাভাবিক লঘুচিত্ততা আর ভব্যতার রূপ ফিরে গেল।

ফিরে এসে বেশীদিন বিশ্রাম নেবার সুযোগ ছিল না। দশই সেপ্টেম্বর তাব নতুন কার্যভার গ্রহণের তারিখ। তাছাড়া নতুন জায়গায় গৃহস্থালী সাজানো, সংসারের যাবতীয় লট-বহর বদলী করা আর বহু জিনিস কেনা-কাটা কি ফরমাস দেবার জন্যও কিছু সময় দরকার। এক কথায়, তিনি যে সব বন্দোবস্ত করবেন বলে স্থির করেছিলেন, প্রাসকভিয়া ফেদরভনাব সিদ্ধান্তের সঙ্গেও তা হুবহু মিলে গেল।

ইভান ইলিচের দাম্পত্য জীবন এই সময় এত শান্তি-ময় হয়ে ওঠে যে বিয়ের প্রথম বছরও এত মিল, এমন শান্তিতে কাটেনি। কারণ সব কিছুই সৌভাগ্যবশতঃ আশানুরূপ ঘটে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মতেরও মিল হল। তাই পরস্পরের দোষ-ত্রুটিও নজরে পড়ত খুব সামান্য। ইভান ইলিচ সপরিবারে নতুন কর্মস্থলে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত করেন! কিন্তু শালা আর শালা বৌ'র বিশেষ অনুরোধে তাকে একলাই রওনা হতে হয়। তার এবং তার পরিবারের প্রতি এরা যেন হঠাৎ একটু বেশী দরদী হয়ে ওঠে।

একলাই তাকে যেতে হয়। কিন্তু কর্মজীবনের সাফল্য আর স্ত্রীর সঙ্গে মতের মিল হওয়ায় মানসিক প্রসন্নতা ক্ষুণ্ণ হল না। একটা অপরটাকে সতেজ ও সজীব করে রাখত। বসবাসের বাড়ীখানি চমৎকার লাগল। স্বামী-স্ত্রী

উভয়েই এমন একখানি বাড়ীর স্বপ্ন দেখেছেন। ঘরগুলি প্রশস্ত, সাবেক কায়দার অভ্যর্থনা কক্ষটি মনোরম, পড়ার ঘরটিও যেমন আরামপ্রদ তেমনি সাজানো-গোছানো। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর জন্য আলাদা কামরা আর ছেলের পড়ার ঘরও ছিল। মনে হত, বিশেষ করে তার পরিবারের জন্যই বুঝি বাড়ীটি তৈরি করা হয়েছিল। সব বন্দোবস্তের তদারকি ইভান ইলিচ নিজেই করেন। নিজেই দেয়ালে লাগাবার কাগজ পছন্দ করে দেন, অতিরিক্ত আসবাবপত্র সাজাবার তদারকি করেন এবং কি করে পর্দা ঝুলাতে হবে তা-ও দেখিয়ে দেন। সব কিছুই ঠিকঠাকমত এগিয়ে যায়। নিজে যেমনটি চেয়েছিলেন সমস্ত ব্যবস্থাই সেই লক্ষ্যের দিকে এগোয়। এমনকি, আধাআধি বন্দোবস্ত হতে না হতেই তার আশা পেরিয়ে যায়। বেশ বুঝতে পারলেন, সাজানো-গোছানো সম্পূর্ণ হয়ে গেলে বাড়ীখানি স্থূল রুচির ছোঁয়াচ মুক্ত হয়ে কি মার্জিত পরিপাটির চেহারাই যে পাবে! ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও তিনি অভ্যর্থনা কক্ষের ছবি চোখের সামনে দেখতে পেতেন। অসমাপ্ত বৈঠকখানার দিকে চেয়েও তার চোখের সামনে অগ্নিকুণ্ড, পর্দা, ওয়াট-নট, এখানে-সেখানে সাজানো ছোট ছোট চেয়ার, দেয়ালে ঝুলানো পিরিচ আর ব্রঞ্জের বাসনপত্রের ছবি ভেসে উঠত। এ ব্যাপারে স্ত্রী ও কন্যার রুচিও তারই মত। তাদের খুশীর কথা ভেবেও তিনি পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। এতটা অবিশ্যি তারাও আশা করতে পারেনি। খুঁজে-পেতে সস্তায় দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিনতেও তার কষ্ট হল

না। এই দুষ্প্রাপ্য জিনিস-পত্তর গোটা বাড়ীতে একটা আভিজাত্যের সৃষ্টি করে। কিন্তু পরিবারের লোকজনকে তাক লাগিয়ে দেবার আশায় চিঠিপত্রে ইচ্ছে করেই সব কিছু তিনি কম করে লিখতেন। সরকারী কাজ তার ভাল লাগত, তবু এই সব জিনিসে তার মন এত মগ্ন হয়ে থাকত যে নতুন কাজে তিনি আশানুরূপ আগ্রহ বোধ করতেন না। মাঝে মাঝে এজলাসে বসেও আনমনা হয়ে পড়তেন। ভাবতেন, পর্দার কার্নিসটা সোজা করা ভাল হবে না বাঁকা করলে ভাল দেখাবে। ঘর সাজাবার কাজ তার এত ভাল লেগে যায় যে নিজেই মাঝে মাঝে হাত লাগিয়ে নতুন করে আসবাবপত্র সাজাতেন কি নতুন কায়দায় পর্দা ঝুলিয়ে দিতেন। মই-এর উপর চড়ে গৃহসজ্জাকারকে পর্দা ঝুলাবার কায়দা দেখিয়ে দিতে গিয়ে একবার তার পা ফসকে যায়। কিন্তু শক্তিমান চটপটে লোক বলে মই আঁকড়ে থাকেন। তবু জানালার ফ্রেমে কোঁকে চোট লাগে। থেঁতলানো জায়গা-টিতে বেশ বেদনা হয়। কিন্তু ব্যথা তাকে কাতর করতে পারল না। একটু বাদেই বেশ সুস্থ বোধ করলেন। স্ত্রীকে লিখলেনঃ মনে হচ্ছে যেন আমার বয়স বছর পনর কমে গেছে। ভেবেছিলেন, সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব ঠিকঠাক করে ফেলবেন। কিন্তু অক্টোবরের মাঝামাঝির আগে হল না। শেষ অবধি অবস্থা যা দাঁড়াল তা শুধু তার নিজের চোখেই মনোরম নয়, যারা দেখল তারাও সবাই অকুণ্ঠ প্রশংসা করল।

মধ্যবিত্তদের মধ্যে যারা বড়লোকী চালে ঘর সাজায় এবং কেবলমাত্র স্বশ্রেণীর অন্যান্যদের সামিল হতে সমর্থ হয়, এই বাড়ীখানিতেও অবিকল সেই সব সংসারের জিনিসপত্তরের দেখা মিলত। ফুল তোলা চাদর, কাল কাঠ, টবে সাজানো চারাগাছ, রাগ্ আর পালিশ করা ময়লাটে ব্রঞ্জের মূর্তি—সবই ছিল এখানে। সম-শ্রেণীর অন্যান্যদের সামিল হবার জন্য এক শ্রেণীর লোক এই সব জিনিস যোগাড় করে। সম-শ্রেণীর অন্যান্য লোকের বাড়ীর সঙ্গে এই বাড়ীর এতটা মিল ছিল যে কেউ এদিকে নজর দিত না। কিন্তু ইভান ইলিচের দৃষ্টিতে বাড়ীখানি অতুলনীয়। সানন্দে তিনি পরিবারের লোকজনকে অভ্যর্থনা করার জন্য স্টেশনে যান এবং তাদের নিয়ে আলোকোজ্জ্বল সদ্য আসবাবপত্রে সাজানো বাড়ীতে ফিরে আসেন। সাদা টাই-পরা এক আরদালি তাদের চারাগাছ-দিয়ে-সাজানো অভ্যর্থনা-কক্ষের দরজা খুলে দেয়। বৈঠকখানা আর পড়ার ঘরে ঢুকে তারা সানন্দ বিস্ময়ে প্রশংসাবাদ করে। ঘুরে ঘুরে ইভান ইলিচ তাদের সব ক'খানা ঘর দেখান আর তাদের প্রশংসাবাদে উল্লসিত হয়ে ওঠেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা চা খাবার সময় প্রাসকভিয়া ফেদরভনা প্রসঙ্গক্রমে তার পড়ে যাবার কথা তোলেন। হো হো করে হেসে ওঠেন ইভান ইলিচ এবং কি করে পা ফসকে গৃহসজ্জাকারীকে ঘাবড়ে দিয়েছিলেন তাই দেখিয়ে দেন।

—ব্যায়াম চর্চা করতাম বলে কিছুই হয়নি। অপর কেউ হলে মারা পড়ত। আমার শুধু একটা ঠোক্কর লেগেছিল···

ঠিক এই জায়গায়। এখনও টিপি দিলে ব্যথা লাগে, তবে ক্রমেই কমে আসছে। সামান্য থেঁতলে গিয়েছিল মাত্র।

এই ভাবেই নতুন বাড়ীতে তাদের বসবাস আরম্ভ হয়। কিন্তু কিছুদিন থাকবার পরেই মনে হল যেন আর একখানা কামরা থাকলে ভাল হত। এ সব ক্ষেত্রে প্রায়শ এমনি ঘটে থাকে। আয় বাড়লেও মনে হয় যেন আরও পাঁচশ রুবল হলে ভাল হত। এই ছুটি খুঁত ছাড়া আর সব কিছুই ঠিকঠাক মত চলতে থাকে।

প্রথমদিকে সব কিছু সাজানো-গোছানো না হওয়া অবধি, অর্থাৎ কিছু কাজ বাকী থাকা পর্যন্ত কোন গোলমাল ছিল না। আজ এ জিনিসটা কেনা হচ্ছে, কাল ওটার জন্য ফরমাস দেওয়া হচ্ছে, পরশু আর একটা জিনিস সরিয়ে নতুন করে সাজানো হচ্ছে—এইভাবেই চলল। মাঝে মাঝে স্বামী-স্ত্রীর মতভেদ ঘটলেও উভয়েই বড় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং উভয়েরই এত কাজ ছিল যে গুরুতর ঝগড়া-ঝাটি হবার সুযোগ জোটেনি। কিন্তু কাজকর্ম ফুরিয়ে যাবার কিছুদিন বাদেই কেমন একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। মনে হল কিসের যেন অভাব রয়েছে। কিন্তু তখন এরা নতুন পরিচয়, নতুন অভ্যাস গড়ে তুলছেন। ক্রমেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে নতুন জীবন।

ইভান ইলিচের সকালবেলা কাটত আদালতে। দুপুরে তিনি খেতে আসতেন। সাধারণত এই সময় তার মেজাজ ভাল থাকত। আবার ঘর-দোরের কোথাও ত্রুটি দেখলে

মাঝে মাঝে চটেও যেতেন। টেবিলের ঢাকনা কি গৃহসজ্জার কোথাও কোন দাগ কিংবা জানালার কাঁচ ভাঙা দেখলে তার মেজাজ বিগড়ে যেত। এই সব সাজাবার জন্য তিনি এত খেটেছেন যে সেই বন্দোবস্তের কোথাও কোন অদল-বদল দেখলে মনমরা হয়ে পড়তেন। মোটামুটি ভাবে তার জীবন অভীষ্ট পথে স্বচ্ছন্দ আরামে আর ভদ্রভাবেই চলতে থাকে।

নটার সময় উঠে কফি খেতে খেতে তিনি কাগজ পড়তেন; তারপর সরকারী পোশাক পরে আদালতে চলে যেতেন। সেখানকার দৈনিক কাজকর্ম ইতিমধ্যেই তার উপযোগী করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেগুলো তিনি অনায়াসে করে যেতেন। আবেদনকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেওয়া, সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া কি সেখানকার কাজকর্ম করা আর প্রকাশ্য কি শাসনতান্ত্রিক অধিবেশনে যোগদান করা—এই তো তার কাজ। গুরুত্বপূর্ণ নতুন কিছুর প্রবর্তনও এখানকার রীতি বিরোধী। তাতে নাকি আমলাতান্ত্রিক কাজকর্মের স্বাভাবিক ধারায় ব্যাঘাত জন্মায়। সরকারী কাজকর্মের ভিত্তিতে এখানকার লোকজনের সঙ্গে শুধু কর্মসংক্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করা চলে। ধরা যাক একটি লোক কোন সংবাদপ্রার্থী হয়ে এল। বিষয়টি যদি ইভান ইলিচের এখ-তিয়ারের না হয় তো লোকটির প্রতি তার কোন কর্তব্য নেই। কিন্তু তার নির্দ্দিষ্ট সরকারী কর্তব্যসংক্রান্ত কোন কাজে যদি লোকটি এসে থাকে আর সেই-কাজ যদি এমন

হয় যে ছাপমারা সরকারী দলিলে প্রকাশ করা যায়, তাহলে এই সম্পর্কের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে তার জন্য ইভান ইলিচ অবশ্যই যথাসম্ভব করবেন। এবং এই কাজ করতে গিয়ে বন্ধুজনোচিত মানবীয় সম্পর্কের আদল বজায় রাখতেও ভুল করবেন না। তার মানে, শিষ্টাচার ও ভব্যতার রীতি পুরোপুরি মেনে চল্‌বেন। কিন্তু এই সরকারী কর্তব্য চুকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আর সব কিছুও খতম হয়ে যাবে।

আসল জীবনকে সরকারী কর্তব্য থেকে আলাদা রাখা আর দুটোকে না মিশিয়ে ফেলার নিখুঁত যোগ্যতা তার ছিল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস আর স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বলে এই ক্ষমতাকে তিনি এমন এক চরম পর্যায়ে নিয়ে এসে-ছিলেন যে বিচক্ষণ কলাবিদের মত মাঝে মাঝে এই মানবীয় ও সরকারী সম্পর্ক ইচ্ছে করে মিশিয়ে দিতেন। কারণ ইচ্ছে করলেই তো আবার যে কোন মুহূর্তে মানবীয় সম্পর্ক দূরে ঠেলে ফেলে নিছক সরকারী মনোভাব অবলম্বন করতে পারবেন।

এই সব কিছুই তিনি অনায়াসে নিখুঁতভাবে এমনকি বিস্ময়কর মুন্সিয়ানার সঙ্গে করে যেতেন। আদালতের বিরতির সময় তিনি ধূমপান করতেন, কফি খেতেন, সামান্য রাজনীতি চর্চা করতেন কিংবা সাধারণ কোন প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ আলোচনা করতেন। কখনও বা তাসের প্রসঙ্গ উঠত। কিন্তু সব চাইতে বেশী আলোচনা হত সরকারী নিয়োগ-বদলী নিয়ে। বাড়ী ফিরতেন ক্লান্ত হয়ে। তবু

যন্ত্রশিল্পীর মত মনে একটা আত্মপ্রসাদ থাকত। নিখুঁতভাবে বাজাবার পর অরকেষ্ট্রার প্রথম বেহালা বাজিয়ের মনে যে আত্মপ্রসাদ থাকে অনেকটা সেই ধরনের। বাড়ী ফিরে দেখতেন: স্ত্রী ও কন্যা কারও সঙ্গে দেখা করতে গেছে কি কোন দর্শনার্থী বসে আছে···ছেলে গেছে স্কুলে কিংবা গৃহশিক্ষকের পড়ানো হয়ে গেছে আর হাই স্কুলে যা শেখানো হয় যথারীতি তাই শিখছে ছেলেটি। যা যেমনটি হওয়া উচিত সব কিছুই সেইভাবে চলছে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর কোন দর্শনার্থী যদি না থাকত তো ইভান ইলিচ সমসাময়িক কোন বহু-আলোচিত বই খুলে বসতেন। সন্ধ্যাবেলা বসতেন কাজ নিয়ে। তার মানে, সরকারী নথিপত্র পড়তেন, সাক্ষীদের জবানবন্দী তুলনা করে দেখতেন এবং তার সঙ্গে আইনের কোন্ ধারা বা উপধারা প্রযোজ্য তাই টুকে রাখতেন। এই কাজ তেমন বিরক্তিকরও নয়, আবার এমন আরামের কাজও নয়। ব্রিজ খেলার সময় কাজটা অবশ্যই বিরক্তিকর লাগত। কিন্তু ব্রিজ না খেললে কোন কিছু না-করা, কি স্ত্রীর সঙ্গে বসে থাকার চাইতে একাজ বরং ভাল। ছোট খাটো ভোজ-সভার আয়োজন করে খুবই আনন্দ পেতেন ইভান ইলিচ। এই সব ভোজসভায় তিনি সমাজের উপরতলার ভদ্রলোক ও মহিলাদের নেমতন্ন করতেন। কিন্তু তার বৈঠকখানার সঙ্গে আর সব বৈঠকখানার সৌসাদৃশ্য ছিল বলে এই সব সখের পার্টিও আর দশটা পার্টির মতই হত।

একবার তারা এক নাচের আসরের আয়োজন করেন।

আসরটি ইভান ইলিচের খুবই ভাল লাগে। সব কিছুই চমৎকার ভাবে নিষ্পন্ন হয়। শুধু কেক ও মিঠাই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার একচোট বচসা হয়ে যায়। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা মনে মনে একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু ইভান ইলিচ সব কিছু একটা ভাল কনফেক্‌শনারের দোকান থেকে আনাবার জন্য জিদ ধরে বসেন। প্রচুর কেকের ফরমাস দেওয়া হয়। কিন্তু কেক থেকে যায় আর মিঠাইওলা পঁয়তাল্লিশ রুবলের বিল পাঠায় বলে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া বাঁধে। শেষ অবধি একটা নিতান্ত বিচ্ছিরি অবস্থা দেখা দেয়। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা তাকে মূর্খ ও ক্লীব বলে ভর্ৎসনা করেন ; আর ইভান ইলিচও দু হাতে মাথা চেপে ধরে ক্রুদ্ধভাবে বিবাহ-বিচ্ছেদের ইঙ্গিত করেন। তবু নাচের আসর ভালই জমেছিল। সমাজের সেরা সেরা লোক এই আসরে উপস্থিত ছিলেন। রাজকুমারী এফনভনার সঙ্গে নাচেন ইভান ইলিচ। 'আমার বোঝা বহন কর' নামে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, রাজকুমারী তার প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠাতার ভগিনী।

সরকারী কাজকর্মের মধ্যে যে আনন্দ তিনি পেতেন তার সঙ্গে উচ্চাভিলাষের আত্মপ্রসাদের যোগাযোগ ছিল। সামাজিক আনন্দের মূলে ছিল অহমিকাবোধ। তবে ব্রিজ খেলার মধ্যেই তিনি সেরা আনন্দ পেতেন! নিজেরমুখেই স্বীকার করতেন, জীবনে যত অপ্রীতিকর ঘটনাই ঘটুক না কেন, ভাল জুটি নিয়ে ব্রিজ খেলতে বসতে পারলে যে আনন্দ পেতেন আলোর ঝলকের মত তা সব কিছু ছাপিয়ে উঠত। ঝগড়াটে জুটি তিনি

পছন্দ করতেন না। আর চারজনে খেলাই ভাল লাগত। পাঁচজন খেলোয়াড় হলে একজনকে পাশে অপেক্ষা করতে হত আর ব্যাপারটা বিরক্তিকর হলেও কিছু মনে না করার ভান দেখাতে হত। তারপর খেলা যদি জমে উঠত তো কথাই নেই। সে অবশ্য তাস পাওয়া না-পাওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করত। খেলা শেষে খাওয়া-দাওয়া আর পাত্র খানেক মদ। ব্যস্! ব্রিজ খেলায় যদি সামান্য জিত হত (বেশী জিতলে ভাল লাগত না) তো বিশেষ খোস মেজাজেই বিছানায় যেতেন ইভান ইলিচ।

এই ভাবেই তাদের জীবন কাটে। সেরা লোকের একটি দল গড়ে ওঠে। এই পরিচিতদের নিয়েই তাদের আড্ডা জমত। গণ্যমান্য কিছু লোক এবং কিছু যুবকও আসত। পরিচিতদের সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী ও কন্যার মতামত অভিন্ন। যত সব অভদ্র বন্ধু-বান্ধব ভালবাসার ভান দেখিয়ে দেয়ালে জাপানী পিরিচ সাজানো বৈঠকখানায় এসে ভিড় করত, নীরবে একজোটে তারা তাদের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতেন। অনতিবিলম্বেই এই অনাহূত বান্ধবেরা আনাগোনা বন্ধ করে দেয়। গলভিনদের আসরে তখন বাছাই করা সেরা লোককটিই থাকে।

যুবকেরা লিসার দিকে নজর দেয়। দিমিত্রি ইভানভিচ পেত্রিশচেভের পুত্র এবং তার একমাত্র উত্তরাধিকারী তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট পেত্রিশচেভ লিসার প্রতি এত মনযোগী হয়ে ওঠে যে ইভান ইলিচ ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা স্ত্রীকে জানিয়ে দেন এবং মনে মনে চিন্তা করেন, ওদের জন্য একটা পার্টির আয়োজন

করা উচিত হবে, না প্রাইভেট কোন নাটকের ব্যবস্থা করলে ঠিক হবে।

এইভাবেই দিন কাটে গলভিনদের। কোন পরিবর্তন না ঘটে বেশ ভালভাবেই কাটে—পরম আনন্দে বয়ে যায় জীবন প্রবাহ।

সবারই স্বাস্থ্য ভাল ছিল। ইভান ইলিচ যদি কখনও মুখে একটা বিচ্ছিরি স্বাদ কিংবা বাঁ কোঁকে কোন অস্বস্তি বোধ করতেন তো তাকে স্বাস্থ্যহীনতা বলা যায় না।

এই অস্বস্তি কিন্তু বেড়ে যায়। ঠিক ব্যথা অনুভব না করলেও ইভান ইলিচ কোঁকে একটা চাপা চাপা ভাব অনুভব করতেন, আর মেজাজটাও খিটখিটে হয়ে উঠল। এই খিটখিটে ভাবটা ক্রমেই এত বেড়ে যায় যে গলভিন পরিবারের শিষ্টাচার সম্মত সহজ শান্তিময় জীবনধারা পর্যন্ত ব্যহত হতে শুরু করে। স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়শ কলহ হতে থাকে। সুখ-শান্তি অনতি-বিলম্বে লোপ পায়। এমনকি শিষ্টাচারও সব সময় বজায় থাকত না। চটাচটির মাত্রা বেড়ে যায়। বিস্ফোরণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রী যে কটি দ্বীপে মিলিত হতে পারতেন তারও সামান্য

কটিই অবশিষ্ট থাকে। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা তখন যদি বলতেন, স্বামীর মেজাজ অসহ্য তাহলে অন্যায় হত না। তবে অদ্ভুত অতিরঞ্জন করেই তিনি অবিশ্যি বলতেন যে ইভান ইলিচের মেজাজ বরাবর দুঃসহ এবং তার নিজের মেজাজ এত ভাল বলেই এই বিশ বছর একসঙ্গে ঘর করতে পেরেছেন।

একথা ঠিক যে আজকালকার ঝগড়ার সূত্রপাত ইভান ইলিচই করতেন। দুপুরের খাবার সময়েই তার মেজাজ ফেটে পড়ত আর তাও প্রায়শ আবার ঝোল খাবার আগে। মাঝে মাঝে তার খেয়াল হত যে একখানা পিরিচ কি একখানা ডিস ভেঙ্গে গেছে, কি রান্না ভাল হয়নি, কিংবা ছেলে টেবিলের উপর কনুই ভর দিয়ে বসে আছে অথবা মেয়ের চুল তার পছন্দসই আঁচড়ানো হয়নি। এই সব কিছুর জন্যই তিনি প্রাসকভিয়া ফেদরভনাকে দায়ী করতেন। প্রথম প্রথম প্রাসকভিয়া জবাব করতেন এবং তাকে কড়া কথা শোনাতেন। কিন্তু একদিন কি দুদিন খাওয়া শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ইভান ইলিচ এমন চটে ওঠেন যে প্রাসকভিয়া ফেদরভনার মনে হয় যেন খাবার খেয়ে তার কোন শারীরিক অসুস্থতা ঘটেছে। কাজেই নিজেকে তিনি সংযত করেন এবং চটপট যাতে খাওয়া হয়ে যায় তার দিকে নজর দেন। নিজের এই সংযমকে তিনি বিশেষ প্রশংসার মনে করতেন। মনে মনে তিনি স্থির করে ফেলেছেন যে স্বামীর মেজাজটি দুঃসহ আর এই মেজাজ তার জীবনটা দুর্বহ করে তুলেছে। নিজের জন্য তখন তার দুঃখ হত। আর যতই নিজের জন্য দুঃখবোধ করতেন ততই স্বামীর

প্রতি ঘৃণা বাড়ত। মনে হত, মরে গেলেই রক্ষা পাওয়া যায়; তবু তার মৃত্যুকামনা তখন তিনি করতেন না, কারণ তাতে মাইনেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। এতে তিনি মনে মনে স্বামীর উপর চটে যেতেন। নিজেকে তখন চরম অসুখী বলে মনে হত; কেননা স্বামী মারা গেলেও তার রক্ষা পাবার উপায় ছিল না। প্রাসকভিয়া এই ক্ষোভ চাপা দিয়ে রাখতেন, তবু এই লুকানো ক্ষোভ ইভান ইলিচের খিটখিটি আরও বাড়িয়ে দিত।

একদিন ঝগড়ার পর (সেদিন অবিশ্যি ইভান ইলিচই বিশেষ অন্যায় করেছিলেন) তিনি স্বীকার করেন যে তার মেজাজটা সত্যিই খিটখিটে হয়ে গেছে এবং তার কারণ অসুখ। স্ত্রী তখন বলেন, তিনি যদি অসুস্থই হয়ে থাকেন তো অসুখের চিকিৎসা করা দরকার এবং ইভান ইলিচ যাতে প্রসিদ্ধ এক ডাক্তারের কাছে যান তার জন্য তিনি পীড়াপীড়ি করেন।

ডাক্তারের কাছে গেলেন ইভান। যা ভেবেছিলেন সবকিছুই সেইমত হল। সব সময়েই হয়ে থাকে। প্রথমত দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হল। তার উপর ডাক্তারের ভারিক্কি চাল। এ মেজাজ তার পরিচিত। আদালতে তিনি নিজে যে মেজাজ দেখান অনেকটা সেই ধরনের। তারপর নানাবিধ শব্দ করে ডাক্তার পরীক্ষা করলেন। এরপর যে সব জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হল তার জবাব পূর্বনির্ধারিত একটি সিদ্ধান্তই সমর্থন করে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে এর কোন প্রয়োজন ছিল না।

তাছাড়া ডাক্তারের চোখ-মুখের ভঙ্গী এই কথাই বলছে ঃ আমাদের উপর যদি নির্ভর করেন তো সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কি কি করা দরকার তার সব আমাদের জানা সকলের সম্পর্কে এক ব্যবস্থা।

এখানকার অবস্থাও ঠিক অদালতের মত। আসামীদের প্রতি তিনি নিজে যে মনোভাব অবলম্বন করেন, ডাক্তারও আজ তার সম্পর্কে অবিকল সেই মনোভাব দেখাচ্ছিলেন।

ডাক্তার বললেন, এই এই লক্ষণ রোগীর মধ্যে এই এই অবস্থার সূচক। আর এই সব বিষয়ের পরীক্ষায় যদি তা প্রতিপন্ন না হয় তো চিকিৎসককে সেই সেই জিনিস ধরে নিতে হবে। আর তিনি যদি সেই সেই জিনিস ধরে নেন তাহলে……।

ইভান ইলিচের কাছে একটি প্রশ্নই গুরুত্বপূর্ণ ঃ গুরুতর কিছু হয়েছে কি ? ডাক্তার এই অবাস্তর প্রশ্ন উপেক্ষা করে যান। তার দৃষ্টিতে এটা বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল সমস্যা হচ্ছে ঃ পুরনো সর্দি জমেছে, না এপেনডিসাইটিস হয়েছে, না মূত্রাশয় ফুলেছে। ইভান ইলিচের জীবন-মৃত্যুর সমস্যা আসল প্রশ্ন নয়; প্রশ্নটা হচ্ছে এপেনডিসাইটিস বা মূত্রাশয় ফোলার। ইভান ইলিচের মনে হল যেন এই সমস্যার চমৎকার সমাধান করে দিলেন ডাক্তার। এপেনডিসাইটিসের স্বপক্ষেই তিনি মত প্রকাশ করলেন। তবে, মূত্র পরীক্ষায় যদি নতুন কিছু ধরা পড়ে তো বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে।

রোগী নিজেও হাজারো বার আসামীদের সম্পর্কে এমনি অপূর্ব রায় দিয়াছেন। ডাক্তারও তেমনি অপূর্বভাবেই বিজয়ীর

মত সগর্বে চশমার ফাঁক দিয়ে অভিযুক্তের প্রতি উৎফুল্ল দৃষ্টিতে চেয়ে তার মন্তব্য শেষ করলেন। ডাক্তারের রায় থেকে ইভান ইলিচ বুঝতে পারলেন যে অবস্থা সুবিধার নয়। কিন্তু ডাক্তার কিংবা অপর সকলের কাছেই ব্যাপারটি উপেক্ষণীয়, তবে তার নিজের পক্ষে খারাপ। এই সিদ্ধান্ত তাকে বেজায় ভড়কে দেয়। নিজের জন্য বড্ড মায়া হয় এবং এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ডক্তোরের উদাসীনতায় তার উপর বিষম বিরক্ত হন।

এর কোন মনোভাবই তিনি প্রকাশ করলেন না। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলের উপর ডাক্তারের ফী রেখে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেনঃ আমরা রোগীরা হয়ত অনেক সময় অসমীচীন প্রশ্ন করে বসি। মোটামুটি বলুন তো, অসুখটা কি গুরুতর?

চশমার উপর দিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে এক চোখে তার দিকে চাইলেন ডাক্তার। যেন বলতে চান ঃ বন্দী, তোমাকে যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তার সঠিক জবাব যদি না দাও তো আদালত থেকে জোর করে সরিয়ে দিতে বাধ্য হব।

যা বলবার তাতো আগেই বলে দিয়েছি। পরীক্ষা করলে আরও কিছু বেরুতে পারে। কথা শেষ করেই ডাক্তার বিদায় অভিবাদন জানালেন।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসেন ইভান ইলিচ এবং বিষণ্নমনে স্লেগায় চড়ে বাড়ী ফেরেন। পথে পথে সারাক্ষণ আপনমনে ডাক্তারের কথাগুলো আলোচনা করলেন। চেষ্টা করলেন সেইসব জটিল দুর্বোধ্য বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সহজ কথায়

বুঝতে; এবং তা থেকে এই প্রশ্নের জবাব বার করতে চেষ্টা করলেন: অবস্থা কি খারাপ? খুবই খারাপ কি? না এখনও তেমন বেশী কিছু হয়নি?

তবু ডাক্তারের মন্তব্য থেকে তার এই কথাই মনে হয়েছে যে অবস্থা বেশ খারাপ। রাস্তার সব কিছু বিচ্ছিরি লাগে। কোচোয়ান, ঘর-বাড়ী, পথচারী আর দোকানপাট—সব কিছুই বিষণ্ণ বলে মনে হয়। ডাক্তারের অনিশ্চিত মন্তব্যে তার বিরামহীন ভোঁতা খামচে ধরার মত ব্যথাবোধটা যেন গুরুতর এক নতুন বৈশিষ্ট্য পায়। নতুন ক্লিষ্ট মনোভাব নিয়ে তিনি ব্যথার প্রকৃতি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

বাড়ী ফিরে স্ত্রীর কাছে সব কথা তিনি খুলে বলতে আরম্ভ করেন। মন দিয়ে তিনি শুনে যান। কিন্তু বিবরণের মাঝামাঝি সময়ে মায়ের সঙ্গে বেরুবার জন্য টুপি পরে মেয়ে ঘরে ঢোকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই বিরক্তিকর কাহিনী শুনবার জন্য তাকে বসতে হয়। কিন্তু বেশীক্ষণ সে সহ্য করতে পারল না। তার মা'ও শেষ অবধি শুনলেন না।

স্ত্রী বললেন, বেশ তো, শুনে খুশী হলাম। এখন থেকে নিয়মিত ওষুধ খেতে শুরু কর। ব্যবস্থাপত্রটা আমাকে দাও, গেরাসিমকে আমি ওষুধের দোকানে পাঠিয়ে দেব'খন।

স্ত্রী ঘরে থাকতে শ্বাস ফেলার ফুরসত পাননি ইভান ইলিচ। সে চলে যাবার পরেই টেনে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। ভাবলেন, তাহলে খারাপ কিছু হয়নি নিশ্চয়ই।

ওষুধ খেতে আরম্ভ করেন ইভান ইলিচ এবং ডাক্তারের নির্দেশ মত চলতে থাকেন। প্রস্রাব পরীক্ষার পর নির্দেশ খানিকটা বদলে যায়। কিছুদিন বাদে প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে চিকিৎসকের সিদ্ধান্ত আর রোগীর উপসর্গে পার্থক্য দেখা দেয়। ব্যাপারটা দাঁড়াল এই ঃ ডাক্তার তাকে যা বলেছে তার সঙ্গে তার লক্ষণ মিলত না। মনে হত, হয় সে ভুলে গেছে, ভুল করেছে কিংবা কিছু লুকিয়েছে। যাই হোক, এ জন্য ডাক্তারকে দোষ দেওয়া যায় না। ইভান ইলিচ তথাপি তার নির্দেশ পালন করে চলতে থাকেন। এবং প্রথম দিকে এই নিয়ম পালনে খানিকটা আরামও পান।

ডাক্তারের কাছে যাবার পর থেকে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্পর্কে তার নির্দেশ পালন করা, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া আর ব্যথা ও মল-মূত্রের প্রকৃতি লক্ষ্য করা ইভান ইলিচের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে। লোকের অসুখ-বিসুখ আর স্বাস্থ্য সম্পর্কে তিনি সবিশেষ কৌতূহলী হয়ে পড়েন। তার সামনে কখনও অসুখ, মৃত্যু কি রোগ-মুক্তির কথা বলা হলে নিজের মানসিক উত্তেজনা চাপা দিয়ে সেই সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতেন। আর রোগটা যদি তার নিজের রোগের মত হত তো শোনা-কথা নিজের রোগ সম্পর্কে প্রয়োগ করতেন।

ব্যথা কমলো না। তবু ইভান ইলিচ জোর করে ভাববার চেষ্টা করতেন যে তিনি ভালই আছেন। কোন উত্তেজনা দেখা না দেওয়া অবধি এ কথা ভাবতে অসুবিধা হত না। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে কখনও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে, সরকারী কাজে

কোন অসাফল্য দেখা দিলে কিংবা ব্রিজ খেলায় খারাপ তাস পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের অসুখ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হয়ে পড়তেন। আগেকার দিনে এই সব দুর্দৈব অনায়াসে সয়ে গেছেন। ভেবেছেন, ত্রুটি সংশোধন করে কিংবা দুর্বলতা দমন করে অচিরেই সাফল্য অর্জন করবেন, কিংবা 'গ্রাণ্ড স্লাম' করে বসবেন। কিন্তু এখন সামান্য দুর্দৈবও বিচলিত করে ফেলে—হতাশায় ডুবিয়ে দিয়ে যায়। মনে মনে বলতেন : এই ছ্যাখ, যখনই ভাল হয়ে উঠছি আর ওষুধটা ফল দিতে শুরু করেছে, তখনই এই অভিশপ্ত দুর্দৈব আর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে সব ভেস্তে দিয়ে গেল। ফলে দুর্দৈবের প্রতি কিংবা যে লোক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়েছে তার উপর বিষম চটে যেতেন। তাকে খুন করার ইচ্ছে হত। নিজে তিনি অনুভব করতেন, এই ক্রোধ তাকে মেরে ফেলবার উপক্রম করছে অথচ তা সামলাবার ক্ষমতা নেই। কেউ কেউ হয়ত বলবেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মানুষের প্রতি এই ক্রোধ যে তার অসুখ বৃদ্ধি করছে এটুকু অন্তত তার মত লোকের বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু নিজে তিনি বিপরীত সিদ্ধান্ত করতেন। বলতেন, তিনি শান্তি চান এবং যত কিছু তার ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে তার সবই তিনি লক্ষ্য করতেন আর শান্তির সামান্য ব্যাঘাতের সম্ভাবনায় চটে উঠতেন। নিজে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বই পড়েছেন এবং ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ল। রোগের অগ্রগতি এমন সুনিশ্চিত ছিল যে একদিনের সঙ্গে অপর দিনের সামান্য পার্থক্যের

তুলনা করেই তিনি নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে পারতেন। কিন্তু ডাক্তারের কাছে গেলেই মনে হত যেন অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে এবং রোজই অতিদ্রুত খারাপ হয়ে চলেছে। এ সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত তিনি তাদের কাছে যেতেন।

সে মাসে তিনি আর একজন নামকরা ডাক্তারের কাছে যান। তিনিও প্রায় আগেকার ডাক্তারের মত অভিমত প্রকাশ করেন। তবে তার জিজ্ঞাসাবাদের ধরনটা কিছু আলাদা। এই নামকরা ডাক্তারকে দেখিয়ে এসে ইভান ইলিচের শংকা-সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। তার এক বন্ধুর বন্ধু ভাল ডাক্তার! তিনি আর সকলের চাইতে ভিন্নমত প্রকাশ করেন। ডাক্তারটি রোগমুক্তির আশ্বাস দিলেও তার প্রশ্ন ও অনুমান ইলিচকে বিস্ময়াবিষ্ট করে এবং তার শংকা আরও বাড়িয়ে দেয়। হোমিওপ্যাথিক এক চিকিৎসক সম্পূর্ণ আলাদাভাবে রোগ নির্ণয় করেন। গোপনে গোপনে ইভান ইলিচ তার ব্যবস্থামত ওষুধ খান। কিন্তু সপ্তাহকাল পরে কোন উন্নতি লক্ষ্য না করে আগেকার ডাক্তার আর এই নতুন ডাক্তারের উপর আস্থা হারিয়ে আরও হতাশ হয়ে পড়েন।

একদিন এক পরিচিতা মহিলা তাকে অলৌকিক এক ইকনের দৈব-শক্তির কথা বলেন। ইকনটি দৈববলে নাকি রোগ সারিয়ে দিয়েছিল। ইভান ইলিচ মন দিয়ে মহিলাটির গল্প শোনেন। একবার তার মনে হল, ঘটনাটি বুঝি সত্যি। এই মানসিক দুর্বলতা তাকে সচকিত করে তোলে। আপন মনে জিজ্ঞাসা করেন: আমি কি এতই দুর্বলচিত্ত হয়ে পড়েছি? দুত্তোর ছাই,

সব বাজে ! ভয়ে এত চঞ্চল হলে চলবে না। একবার এক ডাক্তার যখন ঠিক করেছি তখন তার নির্দেশ মতই চলব। তা-ই করব। আর নড়চড় করা হবে না। এ সম্পর্কে আর ভাববও না—গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত যথারীতি তার ব্যবস্থামত চলব। তারপর দেখা যাবে। এখন থেকে আর দোমনা হওয়া চলবে না।

এ কথা বলা সহজ, কিন্তু কার্যকরী করা কঠিন। কোঁকের ব্যথাটা অনবরত পীড়া দিচ্ছে। ক্রমেই যেন খারাপ ও জোরালো হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। মুখের স্বাদটাও ক্রমেই অদ্ভুত লাগছে। মনে হত যেন শ্বাস-প্রশ্বাসেও একটা বিচ্ছিরি গন্ধ আসে। খিদের অভাব এবং দুর্বলতাও যেন টের পেতেন। আর আত্ম প্রবঞ্চনা করা যায় না। তার দেহের মধ্যে নিশ্চয়ই মারাত্মক নতুন কিছু ঘটছে। জীবনের সমস্ত ঘটনার চাইতে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। অথচ এ সম্পর্কে একমাত্র তিনিই সচেতন। তার চারপাশে যারা আছে, তাদের কেউ বোঝে না কিংবা বুঝবেও না। ভাবছে, সংসারের সব কিছুই যথারীতি চলছে। এই চিন্তা ইভান ইলিচকে আরও বেশী মনস্তাপ দেয়। চোখের উপর দেখছেন, সংসারের সবাই, বিশেষত এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে বেড়াবার নেশায় মত্ত তার স্ত্রী ও কন্যা তার রোগের কিছুই বোঝে না। বরং তার মনমরা ভাব দেখলে কিংবা ফাই-ফরমাস খাটতে হলে বিরক্তবোধ করে। যেন এ জন্য তিনিই দোষী। কথাটা তারা লুকোবার চেষ্টা করলেও তিনি বুঝতে পারতেন, তিনি এখন ওদের পথের কাঁটা। স্ত্রী তার

রোগ সম্পর্কে সুস্পষ্ট একটা সুনির্দিষ্ট মনোভাব অবলম্বন করেছেন। ইভান ইলিচ যা-ই বলুন বা করুন না কেন তার এই মনোভাব বদলায় না। তার মনোভাবটা এই রকম: বন্ধু বান্ধবদের কাছে তিনি বলতেন, জানেন, ইভান ইলিচ ঠিক আর দশজনের মত নয়! ডাক্তারের নির্দেশমত চলতে পারে না। একদিন হয়ত ঠিক মত ওষুধ খেল, পথ্য খেল আবার সকাল সকাল শুতেও গেল। কিন্তু পরদিন যদি আমি খেয়াল না রাখি তো হঠাৎ হয়ত ওষুধ খাবে না, কুপথ্য করবে আর এক নাগাড়ে রাত একটা অবধি তাস পিটবে।

—সেকি, কবে করেছি বলতো! বিরক্তভাবে বলতেন ইভান ইলিচ। —একবারমাত্র পেতর ইভানভিচের বাড়ীতে হয়েছিল।

—কালকে শেবেকের বাড়ীতে রাত জাগনি?

—জেগে না থাকলেও ব্যথার জন্য ঘুম হত না।

—সে যা-ই হোক, অমন করলে অসুখ সারবে না··· আমাদের জ্বালাবে শুধু।

ইভান ইলিচের অসুখ সম্পর্কে প্রাসকভিয়া ফেদরভনা স্বামীর কাছে এবং আর পাঁচজনের কাছেও বলতেন: অসুখের জন্য ইভান নিজেই দায়ী, আর এ হয়েছে তার নতুন এক জ্বালা। ইভান ইলিচ ভাবতেন, এই অভিমত তার এড়িয়ে চলার চেষ্টা; কিন্তু তাতে তার অবস্থার কোন তারতম্য হত না।

আদালতে বসেও ইভান ইলিচ লক্ষ্য করেছেন, অন্তত মনে হত যেন লক্ষ্য করছেন যে লোকজন তার সম্পর্কে এক

অদ্ভুত মনোভাব অবলম্বন করছে। মাঝে মাঝে মনে হত যেন উৎসুক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছে, তার আসন অচিরেই শূন্য হবে। তাছাড়া বন্ধু-বান্ধবও মাঝে মাঝে মনমরা বিষণ্ণভাবের জন্য বন্ধুভাবে তাকে ঠাট্টা করত। তার মধ্যে যে বিভীষিকাময় অপরিজ্ঞাত পরিবর্তন ঘটেছে—সর্বক্ষণ খামচে ধরার মত যে বেদনাটা তাকে ক্লিষ্ট করছে আর দুর্নিবার-ভাবে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে, তা যেন উপহাসের বস্তু। সোয়ার্জের হাসিখুশি সজীব প্রফুল্লতাই তাকে বিশেষভাবে উত্যক্ত করত। কেননা এই প্রফুল্লতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিত যে দশ বছর আগে তিনি নিজে কি ছিলেন।

বন্ধুরা দল বেঁধে তাস খেলতে বসত। নতুন তাস বাঁকিয়ে তারা ভাঁজত। নিজের হাতের রুহিতন এক জায়গায় এনে তিনি দেখতেন যে সাতখানা পেয়েছেন। জুটি 'নো-ট্রাম' ডাকত। দুটো রুহিতন ডেকে তিনি সমর্থন জানাতেন। আর কি চাই? এতে দুজনেরই খুশী এবং চাঙ্গা হয়ে ওঠবার কথা। তারা হয়ত একটা 'গ্রাণ্ড স্লাম' করে বসবেন। কিন্তু ইভান ইলিচ অকস্মাৎ বেদনার টাটানি আর মুখের স্বাদটা সম্পর্কে সচেতন হয়ে পড়তেন। মনে হত, এই অবস্থায় 'গ্রাণ্ড স্লাম' করার আনন্দে উল্লাস বোধ করা হাস্যকর।

মিখাইল মিখাইলোভিচ তার জুটি। তার দিকে তাকাতেন ইভান ইলিচ। সবল হাতে টেবিলের উপর সশব্দে তাস ফেলে ছোঁ-মেরে বাজিটা তুলে না নিয়ে সে আস্তে ইভান ইলিচের দিকে ঠেলে দিত যাতে হাত না বাড়িয়েই তিনি তুলে নিতে

পারেন। ইভান ইলিচ ভাবতেন, ও কি মনে করে আমি এতই দুর্বল যে হাত বাড়াতেও পারি না? খেলার দিকে তখন আর নজর থাকত না। জুটি যে বাজি পাচ্ছে তাতেও তিনি তুরুপ করে বসতেন। ফলে 'গ্রাণ্ড স্লামে'র বদলে তিনটে 'শর্ট' যেত। এর চাইতেও বিচ্ছিরি ব্যাপার হত যখন দেখতেন যে মিখাইল মিখাইলোভিচ এতে বড্ড বিচলিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু নিজে তিনি গ্রাহ্য করতেন না। কেন যে গ্রাহ্য করতেন না সে চিন্তাও মর্মান্তিক।

সবাই বুঝতে পারত যে তিনি কষ্ট পাচ্ছেন। বলত, আপনার ক্লান্তি লাগলে খেলা বন্ধ করতে পারি। খানিকটা বিশ্রাম করুন না। শুয়ে পড়বেন? না, বিন্দুমাত্র ক্লান্তি তার হয়নি। 'রাবার' হওয়া অবধি তিনি খেলতেন। সবাই নীরব ও বিষণ্ণ। ইভান ইলিচের মনে হত যেন নিজের বিষণ্ণতা তিনি এদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন; কিন্তু সে-বিমর্ষতা দূর করার সাধ্য তার নেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে তারা চলে যেত। একাকী বসে ইভান ইলিচ তখন ভাবতেন, তার নিজের জীবন বিষে-জর্জরিত, আর অন্যের জীবনও তিনি বিষিয়ে তুলছেন। নিজের দেহের এই বিষ কিছুতেই কমছে না, বরং ক্রমান্বয় আরও গভীরে প্রবেশ করে তার সমস্ত সত্তা জর্জরিত করে তুলছে।

এই অনুভূতি, বেদনার সঙ্গে এই ভীতি নিয়ে তাকে বিছানায় যেতে হত। প্রায়ই জেগে জেগে অনেক রাত কেটে যেত। পরদিন সকালে উঠতে হবে—পোশাক-আশাক পরে আদালতে গিয়ে লিখতে হবে—কথা বলতে হবে। আর যদি না বেরোন

তো চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বসে থাকতে হবে। অথচ তার প্রতিটি ঘণ্টা যন্ত্রণাদায়ক। এইভাবে গভীর গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গভাবে তাকে বাঁচতে হয়েছে। কেউ তার ব্যথা বোঝে নি ···সমবেদনাও প্রকাশ করেনি কেউ।

*　　　*　　　*

একমাস কেটে যায়···পরের মাসও কাটে তারপর। নববর্ষের আগের দিন শ্যালক শহরে এসে তার বাড়ীতেই ওঠে। ইভান ইলিচ তখন আদালতে। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা গিয়েছিলেন দোকান করতে। বাড়ী ফিরে পড়ার ঘরে শ্যালককে দেখতে পান ইভান ইলিচ। স্বাস্থ্যবান সজীব মানুষ। নিজেই পোর্টমান্ট খুলছিলেন। ইভান ইলিচের পায়েরশব্দ শুনে সে মাথা তোলে···পলকের জন্য নির্বাকভাবে চেয়ে থাকে তার দিকে। এই অপলক চাহনি ইভান ইলিচকে সব কিছু বলে দেয়। শ্যালক বিস্ময়সূচক শব্দ করবার জন্য মুখ হাঁ-করে থেমে যায়। তার এই ভঙ্গীই ইভানের সমস্ত শংকা সপ্রমাণ করে।

—আমি বদলে গিয়েছি বুঝি ?

—হাঁ, পরিবর্তন খানিকটা হয়েছে বটে !

কিন্তু তারপরে শ্যালককে চাহনি-প্রসঙ্গে আবার যতবার তিনি ফিরিয়ে আনতে চাইলেন, সে আর রা-টি করল না। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা বাড়ী ফিরে এলে সে বোনের কাছে চলে যায়। ইভান ইলিচ প্রথমে দরজার দিকে তাকান, তার পর আয়নার সামনে এসে প্রথমে মুখোমুখি দাঁড়ান—তার পর তাকান কাত ভাবে। সস্ত্রীক যে ছবিখানা তুলেছেন তার দিকে চেয়ে নিজের বর্তমান চেহারার সঙ্গে তুলনা করেন। প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে তার। তারপর কনুই অবধি হাতা খুলে নিজের হাতের দিকে তাকান। পরক্ষণেই আবার হাতা নামিয়ে দিয়ে ধপ্ করে গদি-আঁটা আসনের উপর বসে পড়েন। সে রাত্রে তার মুখ আরও কাল হয়ে যায়।

খানিক বাদে আপনমনে বলে ওঠেন, না না, এ চলবে না! লাফ দিয়ে উঠে বসে তিনি টেবিলের কাছে চলে যান এবং মামলার নথিপত্র খুলে পড়তে শুরু করেন। কিন্তু একটানা বেশীক্ষণ পড়তে পারলেন না। কপাট খুলে তিনি বৈঠকখানায় আসেন। বৈঠকখানার বাইরের কপাট বন্ধ। আঙুলে ভর দিয়ে চুপে-সাড়ে কপাটের কাছে এসে তিনি কান পেতে থাকেন।

প্রাসকভিয়া ফেদারভনা বলছিলেন, না, তুমি বাড়িয়ে বলছ।

—বাড়িয়ে বলছি! নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছ না? দেখছ না কেমন মরা মানুষের মত চেহারা হয়ে গেছে? চোখ দুটো দেখেছ? কেমন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে দেখেছ? কিন্তু আসলে ওর রোগটা কি?

কেউ জানে না। নিকোলায়েভিচ (আর একজন ডাক্তার) একটা কি যেন বলেছে—আমি ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু লেশচিতস্কি (বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ) বলেছেন আলাদা কথা……

ইভান ইলিচ তখন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। মনে মনে ভাবেন, মূত্রাশয়…মূত্রাশয়ের স্ফীতি। মূত্রাশয় সম্পর্কে ডাক্তারদের প্রতিটি মন্তব্য একে একে তার মনে পড়ে। কল্পনায় তিনি মূত্রাশয় ধরে আটকে রাখতে চান যাতে নড়ানড়া করতে না পারে। তার মনে হল, এর জন্য আর বিশেষ কি প্রয়োজন! না, আজকেই আবার পেতর ইভানভিচের সঙ্গে দেখা করব। (এই বন্ধুর এক বন্ধু ডাক্তার)। বেল বাজিয়ে তিনি গাড়ি নিয়ে আসার হুকুম দেন এবং রওনা হবার জন্য তৈরী হন।

—কোথায় চললে, হ্যাঁগো? বিশেষ বিষণ্ণ গলায় অতি সদয় দৃষ্টিতে চেয়ে স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেন।

স্ত্রীর এই অতিরিক্ত সদয় দৃষ্টিতে ইভান ইলিচ বিষম চটে যান। বিমর্ষভাবে তাকান স্ত্রীর দিকে।

—পেতর ইভানভিচের সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে।

প্রথমে তিনি পেতর ইভানভিচের কাছে যান। তারপর দুজনে মিলে যান ডাক্তার বন্ধুর কাছে। ডাক্তার বাড়ীতেই ছিল। অনেকক্ষণ তার সঙ্গে আলোচনা করেন ইভান ইলিচ।

তার দেহের অভ্যন্তরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে ডাক্তারের মতামত পর্যালোচনা করে তিনি সব কিছু বুঝতে পারেন।

এপেনডিকসের মধ্যেই ক্ষুদ্র একটা কিছু ছিল। সব কিছু আবার ঠিক হয়ে যেতে পারে। অঙ্গ বিশেষের শক্তি বাড়িয়ে

দিলে এবং অপর এক অঙ্গের প্রক্রিয়া রোধ করলে দোষটুকু মিলিয়ে গিয়ে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। রাতের খাবার সময় পার হয়েই তিনি বাড়ী ফেরেন। খাবার সময় যেন হাসি-খুশিভাবে আলাপও কবলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে কাজকর্মে মন দেবাব মেজাজ ফিরে পেলেন না। শেষ অবধি পড়ার ঘরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করেন। কিন্তু তিনি যে একটি বিষয় একান্তে ঠেলে রেখেছেন, আর কাজ শেষ হয়ে গেলেই যে এই গুরুত্বপূর্ণ অন্তরঙ্গ বিষয়ের প্রতি তার মন অকৃষ্ট হবে, এই চিন্তা কখনও মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। কাজ শেষ করে তিনি উপলব্ধি করলেন, চিন্তাটি এপেনডিক্সের চিন্তা বই আর কিছুই নয়। কিন্তু এ চিন্তা'র কাছে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না। চা খেলেন বৈঠকখানায় গিয়ে। একজন ম্যাজিস্ট্রেট সহ কিছু দর্শনার্থী ছিল সেখানে। এই ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রটি তার কন্যার যোগ্য বর। তারা দুজনে আলাপ করছিল, পিয়ানো বাজাচ্ছিল আবার গানও করছিল মাঝে মাঝে।

প্রাসকভিয়া ফেদরভনার মতে অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিনকার সন্ধ্যা ইভান ইলিচের বেশ প্রসন্নভাবেই কাটে। তবু পলকের জন্যেও তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি যে এপেনডিকসের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা তিনি স্থগিত রেখেছেন। এগারটার সময় সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি শোবার ঘরে যান। অসুস্থতা আরম্ভ হবার পর থেকেই পড়ার ঘরের লাগোয়া ছোট্ট একটি কামরায় শুচ্ছেন। পোশাক ছেড়ে তিনি জোলার একখানি উপন্যাস তুলে নেন। পড়ার বদলে আবার তার

মাথায় পুরনো চিন্তা ঘুরপাক খায়। কল্পনায় আবার এপেন-ডিক্সের ঈপ্সিত উন্নতি অনুভব করেন। মনে হয়, দোষটুকু মিলিয়ে গিয়ে আবার স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ফিরে এসেছে। মনে মনে বলেন, হাঁ, নিশ্চয়! প্রকৃতিকে সাহায্য করতে পারলে আর কিছু দরকার হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের কথা মনে পড়ে। উঠে গিয়ে ওষুধ খেলেন এবং চিৎ হয়ে শুয়ে ওষুধের শুভফল অনুভব করবার চেষ্টা করলেন।—ওষুধটা নিয়মিত খেতে হবে। আর অপকার যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এখুনি অনেক ভাল লাগছে—সত্যি, বেশ ভাল লাগছে। আস্তে তিনি কোঁকে হাত দেন। হাত লাগায় কোন ব্যথা লাগল না তো!—তাইতো, কোন ব্যথা টের পেলাম না তো। ইতিমধ্যেই অনেকটা ভাল হয়ে গেছে নিশ্চয়। কাত হয়ে তিনি আলো নিভিয়ে দেন।···এপেনডিক্স ভাল হয়ে উঠেছে··· দোষটা মিলিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই ···

সহসা সেই সাবেক পরিচিত খামচে ধরার মত ব্যথা অনুভূত হয়। বেদনাটা এবার যেন বেশ জোরেই আসে। আবার মুখে সেই বিরক্তিকর স্বাদ লাগে। সঙ্গে সঙ্গে মনটা দমে যায়···মথাটা কেমন ঝমঝম করে ওঠে। অস্ফুটকণ্ঠে তিনি বলেন, ভগবান! হে ভগবান! আবার এল! না, এ আর সারবে না। সহসা বিষয়টি সম্পর্কে তার দৃষ্টি ভঙ্গী বদলে যায়। মনে মনে বলেন, এপেনডিক্স! মূত্রাশয়······না, এ শুধু এপেনডিক্স বা মূত্রাশয়ের প্রশ্ন নয়, এ জীবন-মরণের সমস্যা! হাঁ, জীবন ছিল, কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে বিদায় নিচ্ছে।

আমার সাধ্য নেই যে তাকে ধরে রাখতে পারি। সত্যি! আর আত্মপ্রবঞ্চনা করে কি লাভ? সবাই হয়ত ব্যাপারটা বুঝছে না। তবে আমি বেশ বুঝতে পারছি যে মরতে চলেছি। এখন শুধু কয়েক সপ্তাহ বা দিনের প্রশ্ন! হয়ত এই মুহূর্তেও হয়ে যেতে পারে! একদিন আলো ছিল কিন্তু এখন অন্ধকার। আমি ছিলাম এখানে কিন্তু চলেছি অন্যত্র। কোথায় চলেছি? আতঙ্কে তার সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। তখন শুধু বুকের ঢিপ ঢিপি অনুভূত হয়।

—আমি যখন থাকব না কি থাকবে তখন? কিছুই থাকবে না। কোথায় যাব মারা গেলে? এই কি মৃত্যু? না না না, আমি মরব না! লাফ দিয়ে উঠে তিনি আলো জ্বালাবার চেষ্টা করেন। কম্পিত হাতে মোম হাতড়াতে গিয়ে মোম ও মোম-দানিটি ঠেলা লেগে মেজের উপরে পড়ে যায়। ধপ করে আবার বিছানার উপর শুয়ে পড়েন ইভান ইলিচ।

বিস্ফারিত চোখে একদৃষ্টে অন্ধকারের পানে চেয়ে আপন-মনে বলেন, কি লাভ? কোন ইতর-বিশেষ হবে না। মৃত্যু··· তার বেশী কিছু নয় তো। তাদের কেউ একথা জানেনা—কিংবা চায়ও না জানতে। আমার জন্য কারও কোন মমতা নেই। (বহু দূরের এক সঙ্গীত আর সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গতের ঝঙ্কার কপাটের ফাঁক দিয়ে তার কানে ভেসে আসে) ওদের কাছে সবই সমান। কিন্তু একদিন তো তাদেরকেও মরতে হবে! মূর্খ! আমি আগে, তারপর ওরা···রেহাই নেই কারও। তবু এখন ওরা আনন্দোল্লাস করছে। জানোয়ার যত সব!

ক্রোধে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। মুহ্যমান করে তোলে দুঃসহ যন্ত্রনা।—সব মানুষকেই এই মর্মান্তিক বিভীষিকার দহনজ্বালা ভুগতে হবে···নিশ্চয়ই কোন একটা গোলমাল ঘটেছে। নিজেকে শান্ত করতে হবে···সব কিছু ভেবে দেখতে হবে গোড়া থেকে। আবার তিনি ভাবতে শুরু করেন।—হাঁ। রোগের প্রথম যা হয়েছিল। কোঁকে চোট খেলাম; কিন্তু সেদিন কি তার পরের দিনও বেশ ভাল ছিলাম। সামান্য ব্যথা লেগেছিল···তারপর আর একটু বেশী লাগে। তারপর ডাক্তারের কাছে গেলাম···সেই থেকে হতাশা আর বিষণ্নতা চলছে। তখন আরও ডাক্তার দেখালাম···তারপর ক্রমে ক্রমে এগিয়ে গেলাম অন্ধকার গহ্বরের মুখে। ক্রমেই আমার শক্তি লোপ পেতে থাকে···চোখ নিষ্প্রভ হয়ে আসে। এরপর প্রতি-নিয়ত এপেনডিক্সের কথা ভাবতে থাকি···এই তো মৃত্যু! আমি ভাবছি এপেনডিক্স সারাবার কথা, কিন্তু মৃত্যু আমার শিয়রে। সত্যিই কি মরব?

আবার মৃত্যু-ভীতি তাকে বিহ্বল করে ফেলে। হাঁ-করে তিনি শ্বাস ছাড়েন, নীচু হয়ে দেশলাই হাতড়াতে থাকেন—কনুই দিয়ে ভর করেন বিছানার পাশের একটা স্ট্যাণ্ডের উপর। এইটেই তার ধরন। কিন্তু ব্যথা লাগে। স্ট্যাণ্ডটার উপরেই বেদম রাগ হয়—আরও জোরে চেপে ধরেন। সেটা উলটে যায়। রুদ্ধশ্বাসে আর হতাশায় আবার তিনি শুয়ে পড়েন। মনে হয়, এখুনি মৃত্যু আসবে।

ইতিমধ্যে অভ্যাগতেরা চলে যেতে শুরু করে। প্রাসকভিয়া

ফেদরভনা তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। একটা কিছু পড়ে যাবার শব্দ শুনে তিনি ঘরে ঢোকেন।

—কি হল?

—কিছুই না। আচমকা আমি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছি।

আবার বেরিয়ে গিয়ে মোম নিয়ে ফিরে আসেন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা। ইভান ইলিচ তখন জোরে জোরে হাঁপাচ্ছেন—মনে হয় যেন হাজার খানেক গজ দৌড়ে এসেছেন। স্ত্রীকে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ উপরে তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন তার দিকে।

—ব্যাপার কি জ্যঁা?

—কি—ছুই—না। আমি উলটে ফেলেছি।

মনে মনে ভাবেন, বলে কি লাভ? বললেও বুঝবে না তো!

প্রকৃতই বুঝতেন না প্রাসকভিয়া। স্ট্যাণ্ডটি কুড়িয়ে মোম জ্বালিয়ে দিয়েই আবার তিনি অভ্যাগতদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাবার জন্য বেরিয়ে যান। ফিরে এসেও দেখেন, শূন্যে চেয়ে একইভাবে শুয়ে আছেন ইভান ইলিচ।

—ব্যাপার কি? বেশী খারাপ ঠেকছ?

—হাঁ।

মাথা ঝেঁকে তিনি বসে পড়েন।

—জান জ্যঁা, আমার মতে লেশচিতস্কিকে ডাকা দরকার।

তার মানে খরচের কথা না ভেবে বিখ্যাত বিশেষজ্ঞকে

ডাকতে হবে। ক্রুর হাসি হেসে ইভান ইলিচ বলেন, না। স্ত্রী আর কিছুক্ষণও অপেক্ষা করেন। তারপর এগিয়ে স্বামীর কপালে চুমু খেয়ে বেরিয়ে যান।

চুমু খাবার সময় স্ত্রীর প্রতি অন্তরের অন্তস্তল থেকে ঘৃণা উথলে ওঠে। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে তাকে সরিয়ে দিলেন না।

—যাচ্ছি! দোহাই ভগবানের, একটু ঘুমোও।

—ঘুমোচ্ছি!

ইভান ইলিচ স্পষ্টই বুঝতে পারেন যে মৃত্যু আসন্ন। কাজেই নিরবচ্ছিন্ন হতাশা আর ঘোচে না।

অন্তরের অন্তস্তলে তিনি টের পান যে মৃত্যু এগিয়ে আসছে। কিন্তু এ ধরনের চিন্তায় তিনি যে শুধু অভ্যস্তই নন তা নয়, সোজা কথায়ই এর অর্থও তার কাছে দুর্বোধ্য লাগে।

কিয়েজভেয়েট্টারের তর্কশাস্ত্রে পড়েছেন : কাইয়াস মানুষ আর মানুষ নশ্বর, অতএব কাইয়াসও নশ্বর। এই যুক্তি কাইয়াস বরাবর সম্পর্কেই প্রযোজ্য বলে মনে হয়েছে। তার সম্পর্কে নিশ্চয়ই নয়! সেই কাইয়াস, সেই বিমূর্ত মানুষ নশ্বর একথা সত্য। কিন্তু ইভান ইলিচ কাইয়াসও নন আবার বিমূর্ত মানুষও নয়। সমস্ত মানুষ থেকে আলাদা জীব তিনি। মা-বাবার কাছে তিনি ছোট্ট ভান্যা মিত্যা ভলদিয়া আর পুতুল কোচোয়ান আর ধাত্রীর কাছে—পরে কাতেংকার কাছেও তার একই পরিচয়। বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত সুখ-দুঃখ-আনন্দের মধ্যে তার একমাত্র পরিচয় ছিল ভান্যা। ভান্যা যে ছোট্ট চামড়ার বলটি

ভালবাসত কাইয়াস ক জানত তার কথা ? কাইয়াস কি তার মাকে চুমু খেয়েছে ? কোনদিন কাইয়াসের জন্য কি তার রেশমী পোশাক অমনভাবে খস্‌খস্‌ করেছে ? প্যাস্ট্রি খারাপ হলে কোনদিন স্কুলে অমন হট্টগোল বাঁধিয়েছে কাইয়াস ? অমন করে ভালও কি বেসেছে কখনও ? পারত কাইয়াস তার মত আদালতে বিচার করতে ? কাইয়াস সত্যই নশ্বর ছিল— সে মরে ভালই করেছে। কিন্তু আমি ? এত চিন্তা, এত আবেগ-ভরা ছোট্ট ভান্যা আর ইভান ইলিচের ব্যাপার সম্পূর্ণ আলাদা। আমি মরব এ হতেই পারে না। সে বড় মর্মান্তিক ঘটনা।

এই ছিল তার মনোভাব।

—কাইয়াসের মত আমাকে যদি মরতেই হয় তো আগে থাকতে তা জানা উচিত ছিল। অন্তর্যামীর বলে দেওয়া উচিত ছিল একথা। কিন্তু কোনদিন নিজের অন্তরে তো তেমন কিছু টের পাইনি ! আমি কিংবা আমার বন্ধু-বান্ধব সবাই ভেবেছে যে আমাদের অবস্থা কাইয়াস থেকে আলাদা। আর এখন দেখছি বিপরীত ! এ হতে পারে না। অসম্ভব ! তবু আজকে তাই সত্য। কি করে হল ? কি করে বোঝা যায় এই রহস্য ?

সত্যিই তিনি বুঝতে পারতেন না। তাই এই অলীক বিষণ্ণ চিন্তা দূর করে দিয়ে সুস্থ সজীব ভাবনায় অন্যমনা হতে চাইতেন। কিন্তু সেই এক চিন্তা, শুধু সেই চিন্তাই নয়—সেই বাস্তব সত্য বারংবার এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াত।

এই চিন্তা চাপা দেবার জন্য পর পর তিনি অন্য কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, এতে যদি মনে বল পাওয়া

যায়। সাবেকদিনে যে সব চিন্তা মৃত্যু-চিন্তাকে আড়াল করে রেখেছে, নতুন করে আবার তিনি তার কথা ভাবতে চাইলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, আগের দিনে যে সব চিন্তা অন্তরে মৃত্যুর অনুভূতি চাপা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, আজ আর তাতে কোন কাজ হচ্ছে না। সাবেক চিন্তা-ধারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসেই আজকাল ইভান ইলিচের অধিকাংশ সময় কেটে যায়। 'আবার আমি কাজে মন দেব—শত হলেও ঐ কাজ নিয়েই তো বেঁচেছিলাম।' সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে তিনি আদালতে চলে যেতেন। আনমনা হবার জন্য আলাপ করতেন সহকর্মীদের সঙ্গে। ওক কাঠের চেয়ারের হাতলে শীর্ণ হাত রেখে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হেলান দিয়ে বসে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতেন জনতার দিকে। কখনও বা নীচু হয়ে নথিপত্র কাছে টেনে কোন সহকর্মীর সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা কইতেন। তার পর সহসা চোখ তুলে সোজা হয়ে বসে জোরে জোরে কয়েকটি কথা ঘোষণা করে আদালতের কাজ শুরু করে দিতেন।

আদালতের কাজ চলবার সময়েই আচমকা হয়ত অনুভব করতেন যে কোঁকের ব্যথাটা আবার খামচাতে শুরু করেছে। মামলার তখন যে অবস্থাই হোক না কেন ইভান ইলিচের দৃষ্টি অমনিই ব্যথার দিকে নিবদ্ধ হত। এই দুশ্চিন্তা হটাবার জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, কিন্তু কোন লাভ হত না। ব্যথাটা হাজির হয়ে যেন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রস্তরের মত অসাড় হয়ে যেতেন। নিষ্প্রভ হয়ে যেত চোখের দীপ্তি। আবার নিজেকে জিজ্ঞাসা

করতেন, এই ব্যথাই তার জীবনে একমাত্র সত্য কি না। তার সহকর্মী আর অধস্তন কর্মচারীরা ক্ষোভে বিস্ময়ে লক্ষ্য করত যে তার মত বিচক্ষণ ধীমান বিচারক বিভ্রান্ত হয়ে ভুল করছে। গা ঝাড়া দিয়ে তিনি নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতেন এবং কোনমতে আদালতের কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরতেন। পথে এই বিষাদভরা অনুভূতি ব্যাকুল করে তুলত যে বিচার বিভাগের কাজকর্ম দিয়ে যা তিনি চাপা দিতে চাইছেন আগের মত আর তা ঢাকা যাচ্ছে না। আদালতের কাজ আর পারছে না তাকে ব্যথার বিভীষিকা থেকে ত্রাণ করতে। তার চাইতেও বিচ্ছিরি ব্যাপার হচ্ছে, তিনি কিছু একটা করুন এই দাবি ব্যথাটা করে না। শুধু চায়, তার দিকে ইভান ইলিচের দৃষ্টি নিবদ্ধ হোক—সব কাজকর্ম ছেড়ে তার মুখোমুখি চেয়ে নীরবে দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করুন।

এই অবস্থা থেকে ত্রাণ পাবার আশায় ইভান ইলিচ সান্ত্বনার খোঁজ করেন। সন্ধান করেন চাপা দেবার নতুন পর্দার। নতুন পর্দা জোটে এবং ক্ষণিকের জন্য তিনি রক্ষেও পান। কিন্তু পরক্ষণেই সেই অবগুণ্ঠন টুকরো টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যায় কিংবা স্বচ্ছ হয়ে পড়ে। মনে হয় যেন ব্যথাটা তাকে ভেদ করে গেছে। এমন কিছুই নেই যা দিয়ে তাকে ঢাকা যায়।

এই শেষের দিকে তিনি নিজের সাজানো বৈঠকখানায় যেতেন। এই বৈঠকখানাতেই তিনি পড়ে যান আর এর জন্যই জীবন খোয়াতে বসেছেন। কথাটা হাস্যকর মনে হয় বটে, তবু তিনি জানেন, এইখানে পড়ে গিয়ে যে চোট লেগেছিল সেই

থেকেই তার রোগের উৎপত্তি। ঘরে ঢুকে নজরে পড়ত যে পালিশ করা টেবিলে আঁচড় লেগেছে। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখতেন যে আলবামের ব্রঞ্জের কারুকার্যটা বাঁকা হয়ে গেছে। মূল্যবান এই আলবামটি তিনি পরম যত্নে সাজিয়ে রেখেছিলেন। হাতে তুলে নিয়ে সেটি তিনি নাড়াচাড়া করতেন। মেয়ে আর বন্ধু-বান্ধবদের অপরিচ্ছন্ন অভ্যাসের দরুন বেজায় বিরক্তও হতেন। কারণ, আলবামটি এখানে-সেখানে ছিঁড়ে গিয়েছিল আর দু চারটে ছবিও মাথা নীচুর দিকে দিয়ে রাখা হয়েছে। সযত্নে আবার তিনি ছবিগুলো সাজিয়ে রাখতেন। বাঁকানো ব্রঞ্জের কারুকার্যটিও ঠিক করে দিতেন সন্তর্পণে। তখন মনে হত, এই সব জিনিস চারাগাছগুলোর পাশে ঘরের অপর প্রান্তে সাজিয়ে রাখলে ঠিক থাকবে। অমনিই আরদালির ডাক পড়ত। কিন্তু আসত মেয়ে কিংবা স্ত্রী। তারা সম্মতি দিত না। স্ত্রী তো প্রতিবাদই করতেন। তর্ক করে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়তেন। এও তবু ভাল। কারণ তখন তিনি ব্যথার কথা ভাবতেন না। ব্যথা তখন অদৃশ্যে লুকিয়ে থাকত।

তারপর তিনি নিজে কিছু সরাতে গেলেই স্ত্রী বলে উঠতেন, থাকনা, চাকরদেরই করতে দাও! তোমার আবার চোট লেগে যেতে পারে। অমনি পলকের মধ্যে পর্দার আড়াল থেকে ব্যথার বিভীষিকা উদ্ভাসিত হয়ে উঠত। স্পষ্টই দেখতে পেতেন তিনি। শুধু একটা উদ্‌ভাস। ভাবতেন, এখুনি আবার লুকিয়ে যাবে। কিন্তু নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোঁকের দিকে মন ঘুরে যেত।—ঠিক আগের মতই বসে বসে খামচাচ্ছে।

আর তিনি ব্যথার কথা ভুলতে পারতেন না। স্পষ্ট দেখতে পেতেন যেন ফুলের আড়াল থেকে সরাসরি তার দিকে চেয়ে আছে।—কি আর হবে এত সব করে ?

—সত্যিই তো, কেল্লা দখল করতে গিয়ে যেভাবে প্রাণ হারাতে পারতাম, ঠিক তেমনিভাবে ঐ পর্দাটার জন্যই প্রাণটা গেল! একি সম্ভব ? কি ভয়ানক—কি নির্বোধের মত কথা! না না, এ সত্য হতে পারে না। নিশ্চয়ই এ সত্য নয়…তবু এই তো সত্যি!

পড়ার ঘরে গিয়ে আবার তিনি শুয়ে পড়তেন। এখন আবার একাকী তিনি ব্যথার মুখোমুখি। এর দিকে চেয়ে আঁতকে ওঠা ছাড়া আর কিছুই করবার নেই।

* * * *

ইভান ইলিচের অসুস্থতার তৃতীয় মাসে দেখা গেল যে স্ত্রী-পুত্র কন্যা বন্ধুবান্ধব ডাক্তার চাকর এমনকি তিনি নিজেও ভাবতে শুরু করেছেন যে অচিরেই তিনি পদ খালি করে দেবেন কি না। অন্তত অন্যান্য লোক তার উপস্থিতির অস্বস্তি থেকে রেখাই পাবে আর নিজে তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন কি না। কেমন করে এই পরিবর্তন এল তা বলা অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে অলক্ষ্যে ব্যাপারটি ঘটে গেছে। অপর লোক সম্পর্কে তার নিজেরও এই একটিমাত্র কৌতূহলই ছিল।

ক্রমে ক্রমে ঘুম কমে আসে। তাকে আফিম খেতে দেওয়া হয়। মরফিয়া ইনজেকশনও করা হল। কিন্তু দুটোর কোনটাতেই কোন উপশম হল না। তন্দ্রালু অবস্থায় প্রথমে

তিনি ঝিমু ঝিমু ভাব অনুভব করলেন। তাতে সামান্য আরাম পেলেন বটে, কিন্তু সে নেহাৎ নতুন অভিজ্ঞতা বলে। পরে এই ব্যবস্থা ব্যথার মত, এমনকি তার চাইতেও বেশী বিরক্তিকর মনে হত।

ডাক্তারের নির্দেশে তার জন্য বিশেষ পথ্য তৈরি করা হল। কিন্তু সে পথ্যও ক্রমেই বিস্বাদ ও বিরক্তিকর লাগত।

তার মল-মূত্রের জন্যও বিশেষ বন্দোবস্ত করতে হয়! কিন্তু এই বিশেষ ব্যবস্থার অপরিচ্ছন্নতা, অশোভনতা, গন্ধ আর অপর একজনকে এই ব্যাপারে অংশ-গ্রহণ করতে হচ্ছে এই অনুভূতির দরুন প্রতিবারেই ব্যাপারটা তার কাছে বিরক্তিকর মনে হত।

তবু এই নেহাৎ অস্বস্তিকর ব্যাপারের মধ্য দিয়েই ইভান ইলিচ স্বস্তি অনুভব করতেন। বাটলারের তরুণ সহকারী গেরাসিম সব সময় ঘরে ঢুকে এই সব নোংরা বাইরে নিয়ে যেত। এই চাষীর ছেলেটি বেশ পরিচ্ছন্ন আর শহুরে খাবার খেয়ে বেশ তাগড়াই চেহারা করে তুলেছে। তাছাড়া সব সময়েই সে হাসিখুশি। প্রথম প্রথম রুশ চাষীর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরা ছেলেটিকে মল-মূত্র পরিষ্কার করার মত ঘৃণার কাজ করতে দেখে ইভান ইলিচ বিব্রত বোধ করতেন!

একবার কমোডে পায়খানায় গিয়ে তিনি এত দুর্বল বোধ করেন যে পাতলুন তুলে দেবার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। ধপ করে একটা নরম আরাম কেদারায় বসে পড়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে নিজের নগ্ন বিশীর্ণ পেশী-জাগা উরুর দিকে চেয়ে থাকেন।

কোমরে পাটের পরিচ্ছন্ন এপ্রন জড়িয়ে পা টিপে দৃঢ় পদ-

ক্ষেপে এগিয়ে আসে গেরাসিম। তার ভারী বুটজুতোয় আলকাতরা আর টাটকা শীতের বাতাসের গন্ধ। ছাপানো শার্টের হাতা দুটো সবল তরুণ বাহুর উপর গুটানো। রুগ্ন প্রভুর মনোভাবের কথা বিবেচনা করেই সে তার দিকে ফিরে চাইল না। যৌবনদীপ্ত মুখের স্বতোৎসারিত আনন্দ চাপা দিয়ে সরাসরি সে কমোডের দিকে এগিয়ে যায়।

দুর্বল কণ্ঠে ইভান ইলিচ ডাক দেন, গেরাসিম।

গেরাসিমের শঙ্কা হয়, কোন গুরুতর অন্যায় করেছে বুঝি। চট করে সদয় সরল কচি মুখখানা ঘুরিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে প্রভুর দিকে। সবে কচি কোমল দাড়ির রেখা পড়েছে সেই মুখে।

—আজ্ঞে স্যর!

—কাজটা তোমার ভাল লাগে না নিশ্চয়ই। আমায় ক্ষমা কর। বড় অসহায় আমি।

—সেকি স্যর! সুদীপ্ত চোখে চকচকে দাঁত বার করে গেরাসিম।—এ আর কষ্ট কি? আপনার যে অসুখ করেছে স্যর!

সুদক্ষ সবল হাতে অভ্যস্ত কাজটি সেরে পা টিপে টিপে সে বেরিয়ে যায়। মিনিট পাঁচেক পরে আবারও পা টিপে ঘরে ঢোকে গেরাসিম।

সদ্য ধোয়া পাত্রটি যথাস্থানে বসিয়ে দেবার পর ইভান ইলিচ আবারও তাকে ডাক দেন, গেরাসিম, আমায় একটু সাহায্য করে যাও। গেরাসিম তার কাছে এগিয়ে যায়।

—আমায় তুলে ধর। উঠতে বড্ড কষ্ট হচ্ছে আর দিমিত্রিকেও পাঠিয়েছি এক জায়গায়।

সবল হাতে সুকৌশলে কিন্তু সন্তর্পণে প্রভুকে ধরে গেরাসিম। ঠিক যে-ভাবে সে ঘরে ঢুকেছিল তেমনি সন্তর্পণে। তার পর তাকে দাঁড় করিয়ে এক হাতে ধরে রেখে অপর হাতে পাতলুন টেনে তুলে দেয়। আবারও তাকে বসিয়ে দিত গেরাসিম, কিন্তু তিনি সোফার কাছে নিয়ে যেতে বলেন। বিনা আয়াসে কোন চাপ না দিয়ে সে তাকে প্রায় উঁচু করে সোফার কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয়।

—ধন্যবাদ। কেমন সহজে সুন্দরভাবে কাজটুকু করে দিলে!

আবারও গেরাসিমের মুখে হাসি ফোটে এবং সে বেরিয়ে যাবার জন্য পেছন ফেরে। কিন্তু ইভান ইলিচ তার উপস্থিতিতে এমন আরাম বোধ করেছেন যে তাকে যেতে দেবার ইচ্ছা ছিল না।

—আর একটা কথা শোন—চেয়ারটা এগিয়ে দাও। না না, ঐটা···আমার পায়ের তলায় দাও। পা দুটো তোলা থাকলে ভাল লাগে।

—চেয়ারখানা তুলে এনে যথাস্থানে পেতে দেয় গেরাসিম এবং ইভান ইলিচের পা দুখানা ধরে চেয়ারের উপর তুলে দেয়। ইভান ইলিচের মনে হল যেন গেরাসিম পা দুটো তুলে রাখবার সময় বেশ ভাল লেগেছে।

—পা দুটো বেশ খানিকটা উঁচু থাকলে ভাল লাগে। কুশনটা এনে পায়ের তলায় দিয়ে দাও না।

প্রভুর আদেশ পালন করে গেরাসিম। আবারও পা তুলে ধরে সে কুশনটা পেতে দেয়। গেরাসিম পা তুলে রাখার সময় আবারও ভাল লাগে ইভান ইলিচের। পা হু'খানা সে ছেড়ে দেবার পর কেমন অস্বস্তি লাগছে মনে হল।

—এখন আর তোমার বিশেষ কোন কাজ আছে গেরাসিম?

—না স্যর! ভদ্রলোকদের সঙ্গে কেমন করে কথা বলতে হয় গেরাসিম ইতিমধ্যেই তা শহুরে লোকের কাছ থেকে শিখে নিয়েছে।

—কি কি কাজ বাকী আছে?

—কি কি করতে হবে? কালকের জন্য চেলা কাঠ কাটা ছাড়া সব কাজই করে ফেলেছি।

—তাহলে আমার পা হুটো আরও একটু উঁচু করে ধরে রাখ। পারবে তো?

—নিশ্চয় পারব। পারব না কেন?

প্রভুর পা হুখানা আরও খানিকটা উঁচু করে ধরে রাখে গেরাসিম। ইভান ইলিচের মনে হল যেন এই অবস্থায় তিনি আর কোন ব্যথাই অনুভব করছেন না।

—কাঠ কাটার কি হবে?

—তার জন্য ভাববেন না স্যর। অনেক সময় রয়েছে তো!

ইভান ইলিচ তখন গেরাসিমকে বসে-বসে পা ধরে রাখতে বলেন। তারপর তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন। কথাটা অদ্ভুত শোনালেও গেরাসিম পা তুলে রাখার সময় সত্যিই ভাল লেগেছে ইভান ইলিচের।

এরপর মাঝে মাঝে গেরাসিমকে ডেকে তিনি কাঁধের উপর পা তুলে রাখতে বলতেন। তার সঙ্গে গল্প করতেও ভাল লাগত। গেরাসিম এত সহজে, এমন সরলভাবে স্বেচ্ছায় কাজটি করত যে তার সদাশয়তা ইভান ইলিচের হৃদয় স্পর্শ করত। অপরের স্বাস্থ্য বল ও জীবনীশক্তি তিনি দেখতে পারতেন না। কিন্তু গেরাসিমের বল ও জীবনীশক্তি তাকে ক্ষুণ্ণ না করে বরং শান্তিই দিত।

যে কোন কারণেই হোক, সবাই ধরে নিয়েছে যে তিনি মৃত্যু-পথযাত্রী নন, শুধু অসুস্থ হয়েছেন মাত্র এবং যদি বিশ্রামে থেকে ঠিক মত চিকিৎসা করান তো অচিরেই সুফল পাওয়া যাবে। এই মিথ্যা প্রবঞ্চনা ইভান ইলিচকে সব চাইতে বেশী মানসিক পীড়া দিত। তিনি অবশ্য জানতেন যে ওরা যা-ই করুক না কেন কিছুই হবে না। শুধু দুঃসহ যন্ত্রণা বেড়ে যাবে আর তার পরিণাম মৃত্যু। সত্যই এই প্রবঞ্চনা তাকে ব্যথিত করত। সবাই যা জানে, তিনি নিজেও যে-কথা বোঝেন, প্রকাশ্যে কেউ তা স্বীকার করতে চায় না। বরং উলটে তার সঙ্কটাপন্ন অবস্থা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে। এবং চায়— শুধু চায় কেন, জোর করে তাকে দিয়েও এই মিথ্যাকথা বলাতে চায়। আসন্ন মৃত্যুর প্রাক্কালে তার সম্পর্কে এই মিথ্যাচারণ এবং জীবনের বিভীষিকাময় পবিত্র সমাপ্তিকে সাধারণ দেখা-সাক্ষাৎ, পর্দা আর খাবার টেবিলের সুখাদ্য মাছের পর্যায়ে অবনমিত করার অপচেষ্টা ইভান ইলিচকে দুঃসহ মনস্তাপ দিত।

নিজের সম্পর্কে লোকজনের এই জাতীয় মন্তব্য শুনবার সময় বহুবার অতিকষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলেন নি ঃ আর মিথ্যে কথা ব'ল না। তুমি জান—আমিও বুঝি যে আমি মরতে চলেছি। কাজেই এ সম্পর্কে আর মিথ্যেকথা না হয় না-ই বললে। অবশ্য এই কথা বলার মত মনোবলও তার ছিল না।

চারপাশের লোকজন তার এই বিভীষিকাময় মর্মান্তিক মৃত্যু-যাত্রাকে যেন একটা আকস্মিক অস্বস্তিকর প্রায় অশিষ্ট ঘটনার পর্যায়ে এনে ফেলেছে। এ যেন লোকের পক্ষে বিচ্ছিরি গন্ধ ছড়িয়ে বৈঠকখানায় ঢোকার মত ঘটনা। আজীবন তিনি নিজে যে শিষ্টাচারের সেবা করে এসেছেন, তারাও ঠিক সেই শিষ্টাচার-সম্মত পদ্ধতিতেই কাজটি করছে। বেশ বুঝতে পারছেন, কেউ তার জন্য সমবেদনা বোধ করে না। কারণ তার এই অবস্থা কারও কাম্য নয়। শুধু গেরাসিমই উপলব্ধি করে এবং তার প্রতি করুণা করে। কাজেই একমাত্র তার সান্নিধ্যেই স্বস্তিবোধ করেন ইভান ইলিচ। গেরাসিম তার পা দুটো ধরে রাখত (মাঝে মাঝে সারা রাতও রেখেছে) এবং বিছানায় যেতে অস্বীকর করে বলত ঃ আপনি ব্যস্ত হবেন না ইভান ইলিচ, পরে আমি ঘুমোবার ঢের ঢের সময় পাব। কিংবা পরিচিতের ভঙ্গীতে আচমকা সে বলে উঠত ঃ আপনি অসুস্থ না হলে আলাদা কথা ছিল, কিন্তু এই অবস্থায় একটু কষ্ট করতে আপত্তি করব কেন ? তখন সত্যিই তিনি পরম স্বস্তি বোধ করতেন। একমাত্র গোরাসিমই মিথ্যাকথা বলে না। হালচাল দেখে

বোঝা যায়, একমাত্র সে-ই তার প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করেছে এবং সে-কথা গোপন করার কোন আবশ্যকতা বোধ করে না, বরং বিশীর্ণ দুর্বল প্রভুর জন্য দুঃখবোধ করে। একদিন ইভান ইলিচ যখন তাকে চলে যেতে বলেন গেরাসিম সরাসরি বলে বসে : আমাদের সবাইকেই একদিন মরতে হবে, কাজেই সামান্য কষ্ট করতে আপত্তি করব কেন? তার মানে সে বলতে চাইছিল : মুমূর্ষু একটা লোকের জন্য একাজ করছে বলে এটা সে বোঝা বলে গণ্য করে না এবং আশা করে যে তার কাল এলেও অপরে তার জন্য এটুকু করবে।

এই মিথ্যাচার ছাড়া, কিংবা হয়ত এর জন্যই একটা জিনিস ইভান ইলিচকে সব চাইতে বেশী ব্যথা দিত : করুণার জন্য যখন তিনি কাঙাল হয়ে ওঠেন, কেউ তখন তার প্রতি দরদ বা সমবেদনা দেখায় না। একটানা কিছুক্ষণ কষ্ট ভোগের পর তিনি চাইতেন যে কেউ তার প্রতি রুগ্ন শিশুর মত সমবেদনা দেখাক। অথচ মুখ ফুটে কথাটা বলতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। সাধ হত, কেউ তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিক—সান্ত্বনা দিক। তিনি জানতেন যে তিনি একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর তার দাড়িতেও পাক ধরেছে, কাজেই যা তিনি চাইছেন তা পূরণ হবার নয়। তবু সাধ হত। কিন্তু তিনি যা চান গেরাসিমের মনোভাবের সঙ্গে তার খানিকটা মিল আছে। সুতরাং তার মনোভাবে সান্ত্বনা পেতেন। কাঁদতে ইচ্ছে করত ইভান ইলিচের। ইচ্ছে হত কেউ তাকে আদর করুক…চোখের জল ফেলুক তার জন্য। তারপর তার সহকর্মী শেবক হয়ত ঘরে

ঢুকত। কান্না বন্ধ করে, আদর পাবার আশা ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে ইভান ইলিচ কঠোর গম্ভীর হয়ে পড়তেন এবং অভ্যাসবশে আপীল আদালতের কোন রায় সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করে নিজের অভিমত সত্য বলে প্রতিপন্ন করতে চাইতেন। চারপাশের এবং নিজের অন্তরের এই মিথ্যাচার তার শেষের দিন কটি বিষিয়ে তোলে।

*   *   *   *

ভোর হয়েছে। ইভান ইলিচ বুঝতে পারেন যে ভোর হয়েছে। কেননা গেরাসিম চলে গেছে আর বেয়ারা পেতর এসে মোম নিভিয়ে জানালার একটা পর্দা টেনে দিয়ে সন্তর্পণে ঘরের জিনিস-পত্তর গোছগাছ করছে। সকাল হোক কি সন্ধ্যা, হোক শুক্রবার হোক কি রবিবার হোক ইভান ইলিচের কাছে সবই আজ সমান। সেই নিরবচ্ছিন্ন দুঃসহ খামচে ধরার মত ব্যথাটা পলকের জন্যও কমে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জীবনের দীপ ম্লান হয়ে আসছে কিন্তু নিভে যায়নি এখনও। এগিয়ে আসছে জীবনের পরম সত্য সেই চির-বিভীষিকাময় চির-ঘৃণাহ মৃত্যু। তবু চারিদিকে সর্বক্ষণ মিথ্যার বেড়াজাল। এ অবস্থায় দিন-ক্ষণ সপ্তাহের মূল্য কি ?

—চা খাবেন স্যার ?

ইভান ইলিচ ভাবেন, ও সব জিনিস গোছ-গাছ করতে চায় আর ভাবে যে ভদ্রলোকেদের সকালবেলা চা খাওয়া উচিত। মুখে বলেন, না।

—ঐ সোফাটায় উঠে বসবেন স্যার ?

আবার তিনি ভাবেন, ঘরটা ও গোছগাছ করতে চায় কিন্তু আমি বাধা দিচ্ছি। আমি যেন নোংরামি আর বিশৃংখলার প্রতীক। তবু মুখে বলেন, দরকার নেই, আমায় একলা থাকতে দাও।

লোকটি তখন ঘরের মধ্যে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চলাফেরা করে। ইভান ইলিচ হাতখানা বাড়িয়ে দেন। অমনিই সাহায্যের জন্য ছুটে আসে পেতর।

—কি চাই স্যর ?

—ঘড়িটা।

হাতের কাছেই ছিল ঘড়িটা। সেটা তুলে নিয়ে পেতর প্রভুর হাতে দেয়।

—সাড়ে আটটা ! ওরা উঠেছে ?

—না স্যর। স্কুলে যাবেন বলে ভ্লাদিমির ইভানিচ (পুত্র) উঠেছেন মাত্র। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা বলেছেন, আপনি ডাকলে যেন তার ঘুম ভাঙানো হয়। ডাকব স্যর ?

—দরকার নেই। মনে মনে ভাবেন : তার চাইতে বরং একটু চা খেলে হয়ত ভাল হয়। বলেন, হাঁ, একটু চা-ই নিয়ে এস।

পেতর দরজা অবধি যায়। কিন্তু একলা থাকতে ভয়-ভয় করে ইভান ইলিচের।—কি করেই বা ওকে রাখা যায় ? ঠিক হয়েছে, ওষুধ খেতে হবে। ডেকে বলেন, আমার ওষুধটা দাও তো পেতর। মনে মনে ভাবেন : খাব না কেন ? এখনও হয়ত কিছুটা উপকার করতে পারে। এক চামচ ওষুধ নিয়ে

তিনি গিলে ফেলেন। কিন্তু ওষুধের পরিচিত বিচ্ছিরি স্বাদ অনুভব করে পরক্ষণেই ভাবেন: না, কোন উপকার হবে না। সব বাজে, সব আত্মপ্রবঞ্চনা। না, আর এর উপর আস্থা রাখা যায় না। কিন্তু ব্যথাটা…ব্যথাটা হচ্ছে কেন? পলকের জন্যও এর হাত থেকে যদি রেহাই পেতাম! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কঁকিয়ে ওঠেন। অমনিই পেতর ফিরে তাকায়।—ঠিক আছে! যাও, চা-টা নিয়ে এস।

পেতর বেরিয়ে যায়। মারাত্মক যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি। তবু একলা থাকার সময় তার জন্য কঁকালেন না। কঁকালেন মানসিক যন্ত্রণায়। দিন নেই, রাত্রি নেই, সদাসর্বক্ষণ ক্ষান্তিহীন একই অবস্থা। ভবিতব্য যদি চটপট এগিয়ে আসত! কোন্ ভবিতব্য এগিয়ে আসবে? মৃত্যু—তিমিরাবরণ?…না না! মৃত্যুর চাইতে অপর যে কোন কিছু শ্রেয়।

পেতর চা নিয়ে এলে আচমকা তিনি বিভ্রান্তের মত তার দিকে তাকান। যেন বুঝতে পারেননি সে কে ও কি। প্রভুর এই চাহনিতে পেতরও খানিকটা বিমূঢ় হয়ে পড়ে। তার বিব্রত ভাবে ইভান ইলিচের হুঁশ হয়।

—ওঃ, চা, ঠিক আছে, রেখে দাও। হাতমুখ ধুয়ে আমায় একটা পরিচ্ছন্ন শার্ট পরতে সাহায্য কর তো!

ইভান ইলিচ হাত-মুখ ধুতে আরম্ভ করেন। জিরিয়ে জিরিয়ে প্রথমে তিনি হাত ধুয়ে নেন, তারপর মুখ ধুলেন। দাঁত পরিষ্কার করে এবং চুল আঁচড়ে তিনি

আয়নায় মুখ দেখেন। মুখের চেহারা দেখে আঁতকে ওঠেন। বিশেষ করে বিবর্ণ কপালে ঝুলে-পড়া শিথিল চুলগুলোই তাকে আতঙ্কিত করে তোলে।

তিনি বুঝতে পারলেন যে শার্ট বদলাবার সময় নিজের কৃশ চেহারার দিকে তাকালে আরও ভড়কে যাবেন; তাই সেদিকে চাইলেন না। জামা বদলানো হয়ে গেল। একটা ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে তিনি চা খাবার জন্য আরাম কেদারায় বসে পড়লেন। পলকের জন্য বেশ ভাল লাগল। কিন্তু চা খেতে শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বিচ্ছিরি স্বাদটা অনুভব করলেন—ব্যথাটাও লাগে। অতিকষ্টে তিনি চা খাওয়া শেষ করলেন এবং পেতরকে বিদায় করে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন।

সব সময় একই অবস্থা। কখনও আশার ঝিলিক দেখা যায়, আবার পরক্ষণেই হতাশার সমুদ্র ফুঁসে ওঠে। ব্যথা সব সময়েই আছে। সব সময় বেদনার অনুভূতি, সর্বদা হতাশা—সব সময় একই অবস্থা। একলা থাকবার সময় আর কাউকে ডাকার প্রবল ইচ্ছা হত। কিন্তু এও তার জানা ছিল যে অপর কেউ এলে অবস্থা আরও খারাপ হবে।

—বোধশক্তি লোপ করার জন্য আর এক মাত্রা মরফিয়া আবশ্যক। এবার ডাক্তারকে অন্য কোন ওষুধের ব্যবস্থা করার কথা বলতে হবে। এভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব—সত্যি অসম্ভব।

এই ভাবে ঘণ্টাছয়েক কেটে যায়। এইবার দরজায় একটা

ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল। ডাক্তার এল কি? সত্যিই তাই। হাসি-খুশি মুখে নধরকান্তি সহৃদয় ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন। তার প্রসন্ন দৃষ্টি যেন বলতে চাইছে: ভড়কে গেছেন তো, দাঁড়ান এখুনি সব ঠিক করে দিচ্ছি। ডাক্তার জানেন যে তার এই মুখ-ব্যঞ্জনা এই রোগীর কাছে অচল। কিন্তু এ ভঙ্গী তিনি বরাবরের জন্য গ্রহণ করেছেন, কখনও তা পরিহার করা সম্ভব নয়। লোকজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কোন লোক যদি সকালবেলা ফ্রক কোট পরে তো তার যেমন পোশাক বদলানো হয় না, ডাক্তারের অবস্থাও সেইরকম।

ডাক্তার বেশ জোরে জোরে হাত রগড়ান।

—ওঃ, কি বেজায় ঠাণ্ডা! বাইরে কনকনে তুষার পড়ছে! আগে একটু গরম হয়ে নেওয়া যাক।

ডাক্তারের কথার ভাবে মনে হয় যেন সে গরম হতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আচ্ছা, এখন বলুন কেমন আছেন?

ইভান ইলিচের মনে হল যেন ডাক্তার বলতে চাইছিল: হাঁ, আমাদের ব্যাপারটা কেমন চলছে? ডাক্তারও বুঝতে পারলেন, যে একথায় কোন কাজ হবে না। তাই বললেন, রাতটা কেমন কেটেছে বলুন।

ইভান ইলিচ তার মুখের দিকে চেয়ে বলতে চাইছিলেন: মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা করে না? কিন্তু ডাক্তার এই প্রশ্ন বুঝতে চান না। তাই বললেন, আগের মতই দুঃসহ। ব্যথা কমেও না আর ছেড়েও যায় না। যদি অপর কোন........

—হাঁ, রোগীদের ঐ এক কথা। এইবার, খানিকটা গরম হওয়া গেছে দেখছি। প্রাসকভিয়া ফেদরভনার মত হুঁশিয়ার মহিলাও আমার মেজাজের প্রশংসা করেন। আসুন, এবার স্বাগতম জানানো যাক। রোগীর হাত চেপে ধরেন ডাক্তার।

তারপর দিলদরিয়া ভাব ত্যাগ করে গম্ভীর মুখে তিনি রোগীকে পরীক্ষা করতে থাকেন। প্রথমে নাড়ী দেখেন, তারপর জ্বর পরীক্ষা করেন....তারপর নানাভাবে শব্দ করে রোগীর এটা-সেটা পরীক্ষা করে দেখেন।

ইভান ইলিচ ভালমত জানেন যে এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পূর্ণ অর্থহীন—নিছক ভড়ং। তবু ডাক্তার যখন হাঁটু ভেঙে বসে তার উপর ঝুঁকে কান লাগিয়ে প্রথমে তার বুক তারপর পেট পরীক্ষা করেন এবং অর্থপূর্ণ গম্ভীর মুখে তার উপর হরেকরকম জিমনাস্টিকের ভাবভঙ্গী দেখান ইভান ইলিচ তখন চুপ করেই ছিলেন। আদালতেও এমনি নীরবে তিনি উকিলদের সওয়াল শুনেছেন। যদিও তিনি ভাল মতই জানতেন যে তারা মিথ্যেকথা বলছে এবং কেন বলছে সে-কথা।

সোফার উপর হাঁটু ভেঙে ডাক্তার তার পরীক্ষা শেষ করবার আগেই দরজায় প্রাসকভিয়া ফেদরভনার রেশমী পোশাকের খসখসানি শোনা যায়। ডাক্তার আসার সংবাদ যথাসময়ে তাকে না দেবার জন্য পেতরকে ধমকাচ্ছিলেন তিনি।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই তিনি স্বামীকে চুমু খান এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে অনেক আগেই তিনি উঠেছেন

কিন্তু সামান্য ত্রুটির জন্য ডাক্তার আসার সময় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে ইভান ইলিচ তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে দেখেন। তার শুভ্রতা, তার নধর কান্তি, তার হাত ও ঘাড়ের পরিচ্ছন্নতা, চিকন চুল আর তার উজ্জ্বল চোখের দীপ্তির সঙ্গে তিনি নিজের অবস্থা তুলনা করেন। সর্বান্তঃকরণে স্ত্রীকে ঘৃণা করেন তিনি। এই ঘৃণার জন্য তার স্পর্শেও বিরক্ত বোধ করেন।

ইভান ইলিচের অসুখ এবং তার নিজের সম্পর্কে প্রাসকভিয়ার মনোভাব এখনও আগের মত আছে। ডাক্তার যেমন রোগী সম্পর্কে অপরিবর্তনীয় এক মনোভাব অবলম্বন করেছেন এবং এখন আর সেই মনোভাব পরিহার করতে পারছেন না, ইভান ইলিচের অসুখ সম্পর্কে প্রাসকভিয়ার মনোভাবও সেই ধরনের। তার ধারণা: করণীয় একটা কিছু তিনি করছেন না এবং সেজন্য তিনি নিজেই দায়ী। এই ত্রুটির জন্য মোলায়েমভাবে স্বামীকে তিনি ভর্ৎসনাও করতেন।

—জানেন, উনি আমার কথা শোনেন না আর যথাসময়ে ওষুধও খান না। এমনভাবে শুয়ে থাকেন যা ওর পক্ষে নিশ্চয়ই অনিষ্টকর—পা দুটো উঁচু করে রাখেন।

গেরাসিম কি ভাবে পা দুটো ধরে রাখে এরপর তিনি তার বর্ণনা দেন।

ডাক্তার খানিকটা অবজ্ঞাভরা করুণার হাসি হাসেন। সে

হাসির অর্থ : কি করা যাবে বলুন, রোগীদের অমন দু'চারটে নির্বোধ খেয়াল থাকে, কিন্তু তার জন্য ওরা ক্ষমার যোগ্য।

পরীক্ষা শেষ করে ডাক্তার ঘড়ির দিকে তাকান। প্রাসকভিয়া ফেদরভনা তখন ইভান ইলিচকে জানান যে অর ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হবে, তবু আজ তিনি বিখ্যাত এক বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি এসে পরীক্ষা করে তাদের বর্তমান চিকিৎসক মিখাইল দানিলভিচের সঙ্গে পরামর্শ করবেন।

—দোহাই তোমার, আপত্তি ক'র না। আমার নিজের জন্যই এত সব করছি। খোঁচা দিয়েই বলেন প্রাসকভিয়া। তিনি বুঝিয়ে দিতে চান যে স্বামীর জন্যই তিনি এত সব করছেন, শুধু তার মুখ বন্ধ করার জন্য কথাটা বললেন। ভুরু কুঁচকে চুপ করে থাকেন ইভান ইলিচ। বেশ বুঝতে পারেন যে এমন মিথ্যা প্রবঞ্চনার বেড়াজাল তাকে ঘিরে ধরেছে যে কোনভাবে এর হাত থেকে ত্রাণ পাবার উপায় নেই।

স্বামীর জন্য প্রাসকভিয়া যা করছিলেন তার সব কিছুই আসলে তার নিজের জন্য। আর নিজের জন্য প্রকৃতপক্ষে যা করছেন সে কথাটা এমন অদ্ভুতভাবে বললেন যাতে স্বামী তার বিপরীত অর্থ করে বসেন।

সাড়ে এগারটার সময় প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ আসেন। আবারও নানাভাবে শব্দ করে পরীক্ষা চলে। রোগীর সামনে এবং পাশের ঘরে মূত্রাশয় আর এপেনডিক্স্ নিয়ে শাস্ত্রীয় আলোচনা করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয় কিছু কিছু। এমন ভারিক্কি

চালে আলোচনা করা হয় যাতে রোগীর জীবন-মৃত্যুর সমস্যার পরিবর্তে প্রশ্নটি মূত্রাশয় আর এপেনডিক্সের গলদের সমস্যা হয়ে ওঠে এবং মিখাইল দানিলভিচ আর বিশেষজ্ঞ এই প্রত্যঙ্গ-দুটির বেয়াড়াপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হন।

গম্ভীর মুখে প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ বিদায় নেন। তবে তার মুখে হতাশার ভাব ছিল না। আশাভরা কাতর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে সসঙ্কোচে ইভান ইলিচ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সেরে উঠবার কোন আশা আছে কি না। উত্তরে বিশেষজ্ঞ জানান, হলপ করে বলা চলে না, তবে আশাও যে নেই এমন নয়। ইভান ইলিচ এমন করুণ দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়েছিলেন যে তাই দেখে ডাক্তারকে ফি দেবার জন্য বেরিয়ে যাবার সময় প্রাসকভিয়া ফেদরভনার চোখেও জল এল।

ডাক্তারের ভরসায় যে আশার আলো জ্বলেছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হল না। সেই ঘর, সেই ছবি, সেই পর্দা, সেই দেয়ালে লাগানো কাগজ আর ওষুধের বোতল—সর্বোপরি সেই বেদনা আগের মতই রয়ে গেল। ইভান ইলিচ আবারও কঁকাতে শুরু করলেন। ডাক্তার তার চামড়ার তলায় একটা ইনজেকশন্ দিলেন। একটু বাদেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন।

গোধূলির সময় তন্দ্রার ঘোর কেটে যায়। তখন তার খাবার দেওয়া হল। কোনক্রমে তিনি কয়েক টুকরো মাংস আর চা গিললেন। তারপর আবার সাবেক অবস্থা দেখা দেয়। তখন রাত হয়ে এসেছে।

খাবার পর রাত সাতটার সময় সান্ধ্য পোশাক পরে প্রাসকভিয়া ফেদরভনা ঘরে এলেন। তার কাঁচুলি-পরা পরিস্ফীত স্তনযুগ পীনোন্নত। মুখমণ্ডলে পাউডারের দাগও ছিল। সকালবেলা স্বামীকে তিনি জানিয়ে ছিলেন যে সন্ধ্যাবেলা তারা সবাই থিয়েটারে যাবেন। অভিনেত্রী সারা বারনহার্ড শহরে এসেছে, তাই তারা আগাম একটা বক্স রিজার্ভ করে রেখেছিলেন। বক্সটা নেবার কথা ইভান ইলিচ নিজেই বলেছিলেন। এখন সে কথা তিনি ভুলে গেছেন; তাই স্ত্রীর প্রসাধন তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। অথচ নিজেই তিনি বক্স রিজার্ভ করার জন্য পেড়াপীড়ি করেছিলেন এবং এর মধ্যে শিক্ষণীয় আর নির্দোষ আনন্দের জিনিস আছে বলে ছেলে-মেয়েদেরও নিয়ে যেতে বলেছিলেন—সহসা কথাটা মনে পড়ায় বিরক্তিটা চেপে যান।

আত্মপ্রসাদ নিয়েই ঘরে ঢোকেন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা, তবু তার মধ্যে একটা অপরাধীর মত ভাব ছিল। স্বামীর পাশে বসে তিনি কুশলবাদ জিজ্ঞাসা করেন! ইভান ইলিচ স্পষ্টই বুঝতে পারলেন, এ নিছক লৌকিকতা—তার রোগ সম্পর্কে জানবার প্রকৃত আগ্রহ প্রাসকভিয়ার নেই। প্রাসকভিয়া ফেদরভনার ধারণা, জানবার কিছুই নেই। তাই শেষ অবধি তিনি আসল কথা পাড়লেন। বললেন: কোনক্রমেই তার যাবার ইচ্ছে ছিল না...তবে বক্সটা নেহাৎ রিজার্ভ করা হয়ে গেছে, আর হেলেন এবং তাদের মেয়ে যাচ্ছে, আর সঙ্গে পেত্রিশচেভও থাকবে (তদন্তকারী ম্যাজিস্ট্রেট—কন্যার প্রণয়ী), তাই না গিয়ে পারছেন না; কারণ ওদের তো আর একলা যেতে দেওয়া চলে

না! তবু ইভান ইলিচের পাশে কিছুক্ষণ বসতে পারলেই তিনি খুশী হতেন। যাই হোক, তার অনুপস্থিতিতে ডাক্তারের নির্দেশ যাতে পালন করা হয় তার জন্যও তিনি হুঁশিয়ার করে দিয়ে যান!

—ওঃ, ফেদর পেত্রোভিচ (প্রণয়ী) ভেতরে আসতে চায়। আসবে? কি গো?

—আসুক।

সান্ধ্য বেশবাসে সজ্জিত মেয়েটি ঘরে ঢোকে। তার যৌবন-দীপ্ত পেলব দেহ-লাবণ্য স্বাস্থ্য ও শক্তির জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আর এই দেহই ইভান ইলিচের যত ক্লেশের কারণ। ভাব-ভঙ্গীতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে মেয়েটি প্রেমে পড়েছে আর রোগ ক্লেশ এবং মৃত্যুকে ঘৃণা করে; কেননা এরা তার সুখের পরিপন্থী।

ফেদর পেত্রোভিচও ঢোকে। তারও পরনে সান্ধ্য পোশাক। যুবকটির চুল কায়দা করে আঁচড়ানো। শিরাল গলায় আঁটসাট শক্ত কলার। সাদা শার্টের বুক অনেকটা নেমে এসেছে। সরু কাল ট্রাউজারের পা দুটো আঁটসাট ভাবে উরুর সঙ্গে জড়ানো। তার একহাতে সাদা দস্তানা। অপেরায় যাবার টুপিটি হাতে ধরে রেখেছে।

নতুন উর্দি আর হাতে দস্তানা পরে স্কুলের ছাত্রটিও তার পেছু পেছু অলক্ষ্যে ঘরে ঢোকে। পুত্রের চোখের নীচে গভীর কাল রেখা। এর অর্থ ইভান ইলিচের অজানা নয়।

ছেলের দিকে চাইলে বরাবর তার দুঃখ হত। তার এখনকার সশঙ্কিত ভীরু চাহনি আরও বিভীষিকাময়। ইভান ইলিচের

মনে হল যেন গেরাসিম ছাড়া একমাত্র ভাগ্যই তার অবস্থা বোঝে এবং তার জন্য সমবেদনা বোধ করে।

সবাই বসে আবারও তার শরীরিক অবস্থার খোঁজখবর জিজ্ঞাসা করে। তারপর কিছুক্ষণসবাই চুপ করে থাকে। লিসা তখন মায়ের কাছে অপেরা-গ্লাসের খোঁজ জিজ্ঞাসা করে। তারপর কে সেটা নিয়েছিল এবং কোথায় রেখেছিল তাই নিয়ে মাতা-পুত্রীর মধ্যে কিছুটা বাদানুবাদ হয়। ফলে একটা অপ্রীতিকর অবস্থা দেখা দেয়।

ফেদর পেত্রোভিচ তখন ইভান ইলিচকে জিজ্ঞাসা করে যে সারা বার্ণহার্ডকে কখনও তিনি দেখেছেন কি না। ইভান ইলিচ প্রথমে প্রশ্নটার অর্থ ধরতে পারেন নি। তারপর বলেন, না, তুমি দেখেছ কখন?

—হ্যাঁ।

একখানি ফরাসী নাটকের নাম করে পেত্রোভিচ।

সারা বার্ণহার্ড ভাল অভিনয় করেছে এমনি খানকয়েক নাটকের নাম করেন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা। কন্যা মায়ের কথার প্রতিবাদ জানায়। এর পর তার অভিনয়ের দক্ষতা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। এমনি আলোচনা বারংবার হয়ে থাকে আর তার প্রকৃতিও একই ধরনের।

এই আলোচনার মধ্যে আড়চোখে ইভান ইলিচের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে যায় ফেদর পেত্রোভিচ। আর সকলেও তখন তার দিকে চেয়ে চুপ করে। ভাস্বর চোখে সরাসরি সুমুখে চেয়েছিলেন তিনি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে রেগেছেন। এই ত্রুটি

সংশোধন করা দরকার অথচ তার কোন সম্ভাবনা ছিল না। নীরবতা ভাঙতে হবে, কিন্তু কিছুক্ষণ সে সাহস কারও হল না। সবাই ভয় পেল, কারণ তাতে যে ভব্য প্রতারণার ফন্দি স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং আসল সত্য কথাটা সকলের কাছে ধরা পড়বে। কিন্তু লিসাই ভরসা করে নীরবতা ভাঙে। তবে সবাই যে-কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিল, লিসার এই সাহসে তা ধরা পড়ে যায়।

বাবার দেওয়া ঘড়ির দিকে চেয়ে আর ফেদর পেত্রোভিচের উদ্দেশ্যে মুচকি হেসে সে বলে, যদি যেতে হয় তো সময় হয়ে গেছে। এই মুচকি হাসির অর্থ শুধু তারা দুজনেই জানে। পোশাক খসখস করে সে উঠে পড়ে।

সবাই তখন একে একে উঠে দাঁড়ায় এবং ইভান ইলিচের কাছে বিদায় নিয়ে চলে যায়।

ওরা চলে গেলে ইভান ইলিচ যেন কতকটা স্বস্তি বোধ করেন। ওদের সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যা ভানও শেষ হয়েছে। কিন্তু ব্যথাটা আগের মতই রয়ে গেল যে! একই ধরনের ব্যথা, একই বিভীষিকা সব কিছু একঘেয়ে করে তোলে। বাড়েও না, আবার কমেও না। মোটামুটি বলতে গেলে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে।

আবার মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায়। সব কিছু একই রকম থাকে—কোনটারই বিরাম নেই। এবং এর অনিবার্য পরিণতি ক্রমান্বয়ে দুঃসহ হয়ে ওঠে।

—হ্যাঁ, গেরাসিমকে পাঠিয়ে দাও। পেত্রের এক প্রশ্নের জবাবে বলেন তিনি।

*   *   *   *

গৃহিণী অধিক রাত্রে বাড়ী ফেরেন। পা টিপে তিনি স্বামীর ঘরে ঢুকলেন ; কিন্তু সে শব্দও ইভান ইলিচ টের পান। একবার চোখ মেলে আবারও তিনি চোখ বুজে থাকেন। গৃহিণীর ইচ্ছা, গেরাসিমকে সরিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ স্বামীর কাছে একলা থাকেন। কিন্তু ইভান ইলিচ চোখ মেলে বলেন, না, চলে যাও।

—ব্যথা কি বেড়েছে ?

—একরকমই আছে সব সময়।

—খানিকটা আফিম খাও না।

রাজী হয়ে খানিকটা খেলেন ইভান ইলিচ। গৃহিণী তখন বেরিয়ে যান।

রাত তিনটে অবধি তিনি আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকেন। মনে হয় একটু একটু করে তাকে যেন তিমিরাবৃত সংকীর্ণ গভীর এক গহ্বরের মধ্যে ঠেলে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু ঠেলেও যেন তলদেশে পাঠানো যাচ্ছে না। এই বিভীষিকার সঙ্গে আছে ব্যথা। ভয়-ভয় করছে, তবু তিনি যেন গহ্বরের মধ্যে ঢুকতে চাইছেন! সংগ্রাম করছেন তবু যেন সহযোগিতাও করছেন। আচমকা তিনি যেন পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তার সংজ্ঞা ফিরে আসে। গেরাসিম বিছানার পায়ের দিকে বসে নীরবে ঝিমোচ্ছিল। আর গেরাসিমের কাঁধে মোজাপরা শীর্ণ পা রেখে তিনি শুয়েছিলেন। সেই ঢাকা মোমের বাতি আর একই ধরনের ব্যথা তখনও আগের মতই ছিল।

—তুমি যাও গেরাসিম। ফিসফিস করে বললেন।

—ঠিক আছে স্যার, আর কিছুক্ষণ থাকছি।

—না, চলে যাও।

গেরাসিমের কাঁধ থেকে পা সরিয়ে তিনি কাত হন। নিজের জন্য দুঃখু হয়। গেরাসিম পাশের ঘরে না যাওয়া অবধি তিনি অপেক্ষা করেন। তার পর আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। কাঁদতে শুরু করেন শিশুর মত। নিজের অসহায়তা আর বিভীষিকাময় নিঃসঙ্গতা, মানুষের নিষ্ঠুরতা আর ভগবানের নির্মমতা এবং তাঁর অস্তিত্বহীনতার জন্য অশ্রু বিসর্জন করেন ইভান ইলিচ।

—কেন এমন করলে ভগবান ? কেন এই অবস্থায় ফেললে ? কেন এমন মর্মান্তিক যন্ত্রণা দিচ্ছ ?

জবাবের প্রত্যাশা তিনি করেননি। তবু কাঁদলেন, জবাব পেলেন না আর পাওয়া যায় না বলে। বেদনা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। তথাপি তিনি নড়াচড়া করলেন না কিংবা ডাকলেন না কাকেও। আপন মনে বললেন ঃ চলুক ! আঘাত করে যাও ! কিন্তু কেন এত সব ? কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ? কেন, কেন এসব ?

এরপর তিনি শান্ত হলেন। শুধু কান্নাই থামালেন না, শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক করে স্থির হয়ে রইলেন। মনে হল যেন কর্ণগোচর কোন কথা শুনছিলেন না, শুনছিলেন নিজের অন্তরের বাণী। অনুভব করছিলেন অন্তরের জাগ্রত চিন্তাধারা।

—কি চাই তোমার ? ভাষায় প্রকাশযোগ্য এই স্পষ্ট জিজ্ঞাসাই যেন তিনি শুনতে পান।

—কি চাই তোমার ? কি চাই বলো। আপনমনে বারংবার তিনি আবৃত্তি করেন।

—কি চাই আমার ? চাই বাঁচতে....চাই কষ্ট না পেতে।

আবারও এমন নিবিষ্টমনে কান পেতে থাকেন যে ব্যথার সুতীব্র অনুভূতিও তার একাগ্রতা বিক্ষিপ্ত করতে পারল না।

—বাঁচতে চাও ? কি ভাবে ? মর্মবাণী জিজ্ঞাসা করে।

—কেমন করে ? কেন, যেমন করে বাঁচছিলাম সেইভাবে —তেমনি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে !

—যেমন করে আগে বেঁচেছ সেই ভাবে ? মর্মবাণী আবারও জিজ্ঞাসা করে।

কল্পনায় তখন তিনি জীবনের আনন্দময় মুহূর্তগুলি স্মরণ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার নিশ্চিন্ত জীবনের পরম আনন্দময় মুহূর্তগুলোও এখন আর আগেকার মত মধুর লাগল না। শৈশবের গুটিকয়েক স্মৃতি ছাড়া আর কোনটাই না। এই শৈশবের মধ্যে সত্যই আনন্দময় এমন কিছু ছিল যা আজকে আবার যদি ফিরে পাওয়া যেত তো সেই পুঁজি সম্বল করে হয়ত বাঁচা চলত। কিন্তু যে শিশু সেই সুখ অনুভব করেছে আজকে তার কোন অস্তিত্ব নেই। এ যেন অপর কারও জীবন-স্মৃতির মত।

জীবনের যে অধ্যায় আজকের ইভান ইলিচকে জন্ম দিয়েছে তার যাবতীয় সুখ-শান্তির অনুভূতি যেন চোখের সামনে

মিলিয়ে যাচ্ছে। অতি তুচ্ছ, এমনকি কুৎসিত বলে মনে হচ্ছে সেদিনকার সব আনন্দ।

বাল্যকাল থেকে যতই তিনি দূরে সরে যাচ্ছেন, যতই এগোচ্ছেন নিজের বর্তমানের কাছাকাছি, আনন্দ বলে সেদিন যা অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছেন আজকে তার সবই অলীক অর্থহীন বলে মনে হচ্ছে। এই পর্যায়ের শুরু কলেজ থেকে। আজকে যা সাচ্চা বলে মনে হয় তাও এই কালের সম্পদ। মনটা তখন দিলদরিয়া ছিল—ছিল বন্ধুত্ব আর আশা। কিন্তু অভিজাত সমাজের জীবনে এমন শুভ মুহূর্তের খোঁজ মেলে না। তারপর কর্মজীবনের প্রথম কয়েক বছর যখন সরকারী চাকরি করেছেন জীবনে তখনও আবার গুটিকতক আনন্দময় মুহূর্ত দেখা দিয়েছিল। একালের জীবন নারীর প্রতি ভালবাসার স্মৃতিতে মধুর। তারপর সব এলোমেলো হয়ে গেছে। জীবন যতই এগিয়ে চলেছে স্মরণীয় সাচ্চা শুভমুহূর্তেরও ততই অভাব ঘটেছে। প্রথমে আরও খানিকটা হ্রাস পেয়েছে···তারপর আরও···তারপর.... ।

তার বিবাহ একটা আকস্মিক ঘটনা। বিয়ের কিছুদিন পরেই এল মোহমুক্তি। তারপর স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজ, বিলাস-ব্যসন আর কপটতা। এ ছাড়া মর্মান্তিক চাকরি-জীবন আর অর্থচিন্তাও ছিল সঙ্গে। বছর খানেক কেটেছে এইভাবে। শুধু এক বছর কেন, দুই দশ বিশ বছরই তো কাটল এই একই ভাবে। যতদিন এই জীবন চলেছে ততই দুর্বিসহ হয়ে ওঠেছে।—এ যেন পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচে নামার মত। অথচ আমি ভেবেছি উপরে উঠছি। আসল অবস্থা তো তাই ছিল। জনসাধারণের দৃষ্টিতে

আমার উন্নতি হচ্ছিল, কিন্তু আসলে ক্রমান্বয় ভাঁটা পড়েছে জীবনে। এখন সব শেষ হয়ে গেছে—বাকী আছে শুধু মৃত্যু!

—ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াল কি? জীবন এমন অর্থহীন এত বিভীষিকাময় হতেই পারে না। আর যদি তা-ই হয় তাহলেই বা আমায় মরতে হবে কেন? কেন মরতে হবে দুঃসহ যন্ত্রণা ভুগে? নিশ্চয়ই কোথাও কোন ত্রুটি আছে।

সহসা তার মনে হয়, হয়ত যেভাবে বাঁচা উচিত ছিল আমিই সেইভাবে জীবন যাপন করিনি। কিন্তু আর সব কিছু যখন যথারীতি করেছি তখন তা-ই বা কি করে হয়? নিজেই নিজের জিজ্ঞাসার জবাব করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্ভব বলে এই চিন্তা মন থেকে বাতিল করে দেন। অথচ এই সমস্যার সমাধানের মধ্যেই জীবন-মৃত্যুর রহস্য নিহিত।

—তাহলে এখন কি চাই তোমার? বাঁচতে চাও? কেমন করে বাঁচবে? প্রতিহারী যখন ঘোষণা করত 'বিচারক আসছেন', সেই সময় আদালতে যে ভাবে জীবনযাপন করেছ সেইভাবে বাঁচতে চাও?

—বিচারক আসছেন···বিচারক আসছেন। কথাটা তিনি বারকয়েক আবৃত্তি করেন।

—এই যে, তিনি এসেছেন। কিন্তু তার জন্য আমি দোষী নই! ক্রুদ্ধভাবে তিনি চড়াগলায় বলে ওঠেন।

—তাহলে, তাহলে কেন এই দুর্ভোগ?

তার কান্না থেমে যায়। দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বারবার তিনি একই প্রশ্ন ভাবতে থাকেন: কেন, কিসের জন্য

এই দুর্ভাগ্য ? কিন্তু যতই চিন্তা করুন না কেন, কোন জবাবই পাওয়া গেল না। যখনই মনে হয়েছে যথাযথভাবে জীবন যাপন করা হয়নি (বারে বারেই এ কথা মনে জেগেছে), অমনিই নিজের গোটা জীবন নির্ভুল বলে সাব্যস্ত করে এই অদ্ভুত চিন্তা মন থেকে বাতিল করে দিয়েছেন।

আর এক পক্ষও কাটে। ইভান ইলিচ এখন আর সোফা ছেড়ে ওঠেন না। বিছানায় আর শুতে চান না। দেয়ালের দিকে মুখ করে প্রায় সারাক্ষণ সোফার উপরে পড়ে থাকেন। কিন্তু ব্যথার নিবৃত্তি নেই। একাকী এইভাবে পড়ে-পড়ে একই ধরনের সমাধানাতীত প্রশ্নের কথা ভাবেন : এর নাম কি ? এ-ই কি মৃত্যু ? মর্মবাণী জবাব দেয়, হাঁ, এই-ই মৃত্যু।

—তাহলে কেন এই যন্ত্রণা ?

অন্তর্যামী বলে ওঠে, কোন কারণ নেই—তবে এই তার প্রস্তুতি। এছাড়া এবং এর বাইরে আর কোন কিছু ছিল না।

অসুখের প্রারম্ভ থেকে, অর্থাৎ ডাক্তার দেখাবার দিন থেকে ইভান ইলিচের জীবন দুটি পরস্পর বিরোধী মনোভাবের মধ্যে দোল খেয়ে চলেছে। একবার তিনি হতাশ হয়ে পড়তেন। অজ্ঞেয় বিভীষিকাময় মৃত্যুর শংকা তাকে অভিভূত করে ফেলত। আবার আশা জেগে উঠত। একাগ্রমনে তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অনুধাবন করবার চেষ্টা করতেন। এক একবার তার মানস চক্ষে বিকল মূত্রাশয় বা অন্ত্রের ছবি ভেসে উঠত। আবার মনে পড়ত দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় করাল মৃত্যুর কথা—কোন ভাবেই তার গ্রাস থেকে ত্রাণ পাবার উপায় নেই। অসুখের

প্রথম অবস্থা থেকেই মনের এই দ্বৈতভাব চলেছে। কিন্তু রোগ যতই বেড়েছে নিজের মূত্রাশয় সম্পর্কে ধারণা ততই শংকাকুল আর উদ্ভট হয়ে উঠেছে। আসন্ন মৃত্যুর শঙ্কাও ততই বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই সময় তার মাস তিনেক আগেকার অবস্থা মনে পড়ত। বর্তমানের সঙ্গে তুলনা করে স্পষ্টই বুঝতে পারতেন যে ক্রমান্বয় এমন সুনিশ্চিত ভাবে তিনি অধোমুখে নেমে চলেছেন যে নিরাময় হবার সব আশা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

সোফার উপর কাত হয়ে পড়ে তার মনে হ'ত যেন চরম নিঃসঙ্গতা তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জনবহুল শহরে অগুনতি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে তিনি বসবাস করছেন, তবু এমন নিঃসঙ্গতা বোধহয় সমুদ্রের অতলে কিংবা বসুন্ধরার গর্ভেও মেলে না। এই বিভীষিকাময় নিঃসঙ্গতার মধ্যে একমাত্র অতীতের স্মৃতি সম্বল করে বাঁচতে হয়েছে ইভান ইলিচকে। একের পর এক অতীতের স্মৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তারপর ক্রমান্বয় সরে গেছে সুদূর অতীতে—থেমে দাঁড়িয়েছে শৈশবে গিয়ে।

সেদিন তাকে প্লামের ক্বাথ খেতে দেওয়া হয়। প্লামের কথা মনে হলেই ছেলেবেলার কাঁচা শুটকো ফরাসী প্লামের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে তার অদ্ভুত গল্প আর আঁটি চুষবার সময় লালা ঝরার কথা। সেই স্বাদ স্মরণ হতেই সেকালের এক দঙ্গল স্মৃতি মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে ধাত্রী, তার ভাই আর তাদের খেলনার কথা।

—না না, ওর কথা আর ভাবব না···বড় মর্মান্তিক। মনে

মনে ভাবেন ইভান ইলিচ এবং চিন্তার রাশ টেনে সাম্প্রতিক কালে ফিরে আসেন। ভাবেন সোফার বোতাম আর তার মরক্কো চামড়ার ভাঁজের কথা।

—মরক্কোর দাম বেশী, তবে জিনিসটা তেমন ভাল দেখায় না। এ নিয়ে ঝগড়াও হয়েছিল। সে ঝগড়ার ধরন আলাদা; আর বাবার পোর্টফোলিও ব্যাগ আমরা যখন ছিঁড়েছিলাম তার মরক্কো চামড়াও ছিল অন্য ধরনের। সেজন্য আমাদের শাস্তি পেতে হয়েছিল···আর মা আমাদের কিছু মিঠাই এনে দিয়েছিলেন।

আবারও তার চিন্তা শৈশবে ফিরে যায়, আর সে স্মৃতি মর্মান্তিক লাগে। জোর করে তিনি এই ভাবনা দূর করে দিতে চান। মন নিবদ্ধ করতে চান অপর কিছুর উপর।

আবার সেই চিন্তাধারার সঙ্গে আরও কতগুলো জোটবাঁধা চিন্তা মানসপট অতিক্রম করে যায়ঃ কেমন করে ক্রমান্বয় তার অসুখ বেড়েছে আর কেমন করেই বা তা ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে। এখানেও যতই পেছনের দিকে তাকান, ততই জীবনের সন্ধান পান। পেছনেই যেন জীবনের যত কিছু ভাল ছিল। এমনকি সত্যিকারের জীবনও যেন ছিল তখন। দুটো একসঙ্গে জড়িয়ে যায়। ভাবেন, ব্যথাটা যত উগ্র হচ্ছে জীবনও যেন ততই দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। জীবনের সূচনায় একটুখানি ভাস্বর দীপ্তি আছে, তারপর যত এগিয়ে গেছি জীবনপট ততই যেন দ্রুততর মসীলিপ্ত হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর যত কাছে এগিয়েছি ততই ভাস্বর দীপ্তি লোপ পেয়ে জীবনপটে বেশী করে কালির

দাগ পড়েছে। উঁচু থেকে প্রস্তরখণ্ড যত নীচে গড়িয়ে পড়ে ততই তার গতিবেগ বেড়ে যায়। উপমাটি সহসা তার মনে পড়ে যায়। ঠিক এমনি ক্রমবর্ধমান নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভরা জীবন দুর্নিবার বেগে ধেয়ে যায় তার শেষ পরিণতির দিকে। এই মর্মান্তিক দাহ তুলনাহীন।

—আমিও কি উড়ে চলেছি সুদূরে···

সহসা তিনি শিউরে ওঠেন। একটু উঁচু হয়ে চিন্তাস্রোতে বাধা দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই টের পান যে প্রতিরোধের চেষ্টা নিষ্ফল। চেয়ে-চেয়ে চোখদুটো ক্লান্ত হয়ে গেছে, তবু চোখের সামনের জিনিস না দেখেও উপায় নেই। তাই একদৃষ্টে সোফার পিছনের দিকে চেয়ে সেই বিভীষিকাময় পতন, আঘাত আর ধ্বংসের প্রতীক্ষা করেন।

আপনমনে বলেন ঃ প্রতিরোধ করা অসম্ভব। কিন্তু এ সবের অর্থও যদি অন্তত বুঝতে পারতাম! কিন্তু তাও অসম্ভব। এই কথা যদি বলা যেত যে আমি যথাযথভাবে জীবনযাপন করিনি, তাহলেও একটা সাফাই দেওয়া চলত। কিন্তু সে দোষ দেওয়া চলবে না।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনের যাবতীয় আইনসিদ্ধ নিখুঁত শিষ্টাচার-সম্মত আচার-আচরণের কথা মনে পড়ে। ভাবেন, সে কথা কোনক্রমেই স্বীকার করা যায় না। ব্যঙ্গ-ভরা হাসির আবেগে তার ঠোঁট ফাঁক হয়। যেন সামনে বসে কেউ তার কথা শুনছে আর একথা বিশ্বাস করবে।—না, কোন ব্যাখ্যা নেই! মনস্তাপ···মৃত্যু···কেন···কিসের জন্য?

*   *   *   *

আরও সপ্তাহ দুয়েক কাটে এইভাবে? এই পক্ষে এমন একটি ঘটনা ঘটে যা ইভান ইলিচ আর প্রাসকভিয়া উভয়েরই ঈপ্সিত। পেত্রিশচেভ সামাজিক রীতি অনুসারে বিয়ের প্রস্তাব করে। ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যাবেলা। কথাটা স্বামীকে জানাবার উদ্দেশ্যে পরদিন প্রাসকভিয়া ফেদরভনা তার ঘরে এলেন। কিন্তু আগের রাত্রে ইভান ইলিচের অবস্থা বদলে গিয়ে আরও খারাপ হয়ে পড়েছে। প্রাসকভিয়া ঘরে ঢুকে দেখেন যে স্বামী তখন সোফায় শুয়ে আছেন, কিন্তু এবারকার শোয়ার ধরন আলাদা। চিৎ হয়ে শুয়ে তিনি কঁকাচ্ছেন আর স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের দিকে।

প্রাসকভিয়া তাকে ওষুধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। কিন্তু তার দিকে চোখ ঘুরিয়ে ইভান ইলিচ এমন দৃষ্টিতে তাকান আর সেই চাহনির মধ্যে বিশেষ করে তার প্রতি এমন বিদ্বেষ-ভরা ছিল যে প্রাসকভিয়া কথাটা শেষ করতে পারলেন না।

ইভান বলে ওঠেন, দোহাই খ্রীস্টের, আমায় একলা থাকতে দাও।

প্রাসকভিয়া হয়ত চলেই যেতেন, কিন্তু এই সময় কন্যা ঘরে ঢুকে বাপকে প্রাতঃ-সম্ভাষণ জানাবার জন্য এগিয়ে যায়। স্ত্রীর দিকে যে ভাবে চেয়েছিলেন তেমনি কঠোর দৃষ্টিতে কন্যার দিকেও তাকান ইভান ইলিচ। আর তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে কন্যার জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে রুক্ষভাবে জানিয়ে দেন যে শিগগিরই

তিনি তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে যাবেন। উভয়েই চুপ করে যায় এবং খানিকক্ষণ বসে উঠে পড়ে।

লিসা মাকে বলে, আমাদের দোষ কি ? এমনভাবে বললেন যেন যত দোষ আমাদেরই। বাবার জন্য মায়া হয়, কিন্তু আমাদের তিনি যন্ত্রণা দেবেন কেন।

যথাসময়ে ডাক্তার আসে। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে ইভান ইলিচ সংক্ষেপে 'হাঁ' 'না' জবাব দেন। পরিশেষে বলেন ঃ আপনি বেশ বুঝতে পারছেন যে রোগ সারাবার ক্ষমতা আপনার নেই, কাজেই আমায় একলা থাকতে দিন।

—আমরা আপনার কষ্টের লাঘব করতে পারি।

—তাও পারেন না। যেমন আছি সেইভাবেই থাকতে দিন।

ডাক্তার তখন বৈঠকখানায় গিয়ে প্রাসকভিয়া ফেদরভনাকে জানায় যে রোগীর অবস্থা খারাপ এবং একমাত্র আফিমেই তার মর্মান্তিক ক্লেশ লাঘব হতে পারে।

তিনি আরও জানান যে ইভান ইলিচের দৈহিক ক্লেশ সাংঘাতিক হলেও তার মনস্তাপ দৈহিক ক্লেশের চাইতেও মর্মান্তিক আর সেইটেই ওর প্রধান মর্মপীড়ার কারণ।

সে-রাত্রে তার মনস্তাপের আর একটি কারণ ঘটে। তন্দ্রালু সরল গেরাসিমের গাল-চোয়াড়ে মুখের দিকে চেয়ে সহসা এই প্রশ্ন তার মনে জাগে ঃ গোটা জীবনে সত্যই যদি ভুল করে থাকি ?

আগে বরাবর তার মনে হয়েছে যে জীবনে কোন অনাচার তিনি করেন নি। কিন্তু সেইরাত্রে এই দৃঢ়-বিশ্বাস শিথিল হয়ে

যায়। তার মনে হয়ঃ অভিজাত সমাজ যাকে ভাল বলে গণ্য করে সেই শ্রেয় লাভ করতে গিয়ে তিনি এমন কতগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্বাভাবিক বৃত্তি দমন করেছেন, জীবনে হয়ত সেই বৃত্তিগুলোই একমাত্র সাচ্চা জিনিস আর সব কিছু ভুয়ো। তার সরকারী কর্তব্য, নিজের ও পরিবার পরিজনের গোটা জীবনে-বিধি আর তার সামাজিক ও চাকরি-জীবনের সমস্ত আগ্রহই হয়ত মিথ্যা। মনে মনে জীবনের এই সব কিছু তিনি সমর্থন করবার চেষ্টা করেন। অমনিই সমর্থিত বস্তুর দুর্বলতা ধরা পড়ে যায়।—না, সমর্থনযোগ্য কিছুই নেই।

আপনমনে তখন বলেন, তাই যদি হয়, আমি যখন এই উপলব্ধি নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করছি যে প্রকৃতির সমস্ত দান আমি হেলায় হারিয়েছি এবং আর তা সংশোধন করার উপায় নেই, তারপর—তারপর কি হবে?

চিৎ হয়ে শুয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তিনি গোটা জীবন পর্যালোচনা করেন। সকালবেলা প্রথমে বেয়ারা, তারপর স্ত্রী-কন্যা, তারও পরে ডাক্তারের সঙ্গে যখন তার দেখা হয়, তাদের প্রতিটি ভাবভঙ্গী ও কথা প্রমাণিত করে যে গত রাত্রে সত্যের নিষ্ঠুর রূপ তার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তার মধ্যেই তিনি নিজের আসল রূপ দেখতে পান—বুঝতে পারেন আদতে কিসের মোহে তিনি বেঁচেছেন। স্পষ্টই তিনি বুঝতে পারেন, এর কোনটাই সাচ্চা নয়। সব কিছু বিরাট এক ধাপ্পা আর প্রহসন। আর এই ধাপ্পাই জীবন-মৃত্যুর আসল রূপ আচ্ছন্ন করে রাখে।

এই অনুভূতি তার দৈহিক ক্লেশ দশগুণ বৃদ্ধি করে। যন্ত্রণায়

ছটফট করে তিনি এপাশ-ওপাশ করেন। বেশবাস শ্বাসরোধ করেছে বলে মাঝে মাঝে তাই ধরে টানাটানি করেন। এ জন্য সব কিছুর উপর ঘৃণা হয়।

তাকে একটু বেশী মাত্রায় আফিম দেওয়া হল। ফলে তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন, কিন্তু দুপুরবেলা আবার যন্ত্রণা শুরু হয়। সবাইকে ভাগিয়ে দিয়ে তিনি ছটফট করেন।

স্ত্রী কাছে এসে বলেন, জ্যাঁ, আমার জন্য এটুকু কর ডিয়ার। এতে কোন ক্ষতি হবে না, বরং আরামই পাবে। সুস্থ লোক প্রায়ই এ করে থাকে।

বিস্ফারিত চোখে তিনি তাকান।

—কি বললে? ধর্মালাপ করব? কেন? কোন দরকার নেই! তবে···

প্রাসকভিয়া কাঁদতে শুরু করেন।

—দোহাই তোমার! আমি পুরুতকে ডেকে পাঠাচ্ছি। লোকটি বড় ভাল।

—বেশ! ভাল! বিড় বিড় করে বলেন ইভান ইলিচ।

পুরোহিতের কাছে পাপ স্বীকার করে ইভান ইলিচের মনটা হালকা হয়ে যায়। শংকা-সন্দেহও কিছুটা কমে গেছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বেদনারও লাঘব হল। পলকের জন্য আশার আলো ঝলমল করে ওঠে। আবারও এপেনডিক্সের কথা মনে পড়ে। ভাবেন, হয়ত সেরেও যেতে পারে। জলভরা চোখে তিনি পুরোহিতের আশীর্বাদ গ্রহণ করেন।

আবার তাকে শুইয়ে দিলে ইভান ইলিচ খানিকটা স্বস্তি

বোধ করেন। বাঁচার ক্ষীণ আশাও সঞ্চারিত হয়। তখন অস্ত্রোপচারের কথা ভাবতে শুরু করেন। সে প্রস্তাব আগেই করা হয়েছে। আপনমনে বলে ওঠেন, বাঁচব! বাঁচতে চাই!

পুরোহিতের সঙ্গে কথোপকথনের পর স্ত্রী এসে তাকে অভিনন্দন জানান। তারপর স্বাভাবিক ভব্যতার রীতি অনুযায়ী বলেন, এখন ভাল লাগছে, তাই না?

তার দিকে না চেয়েই তিনি জবাব দেন, কতকটা।

প্রাসকভিয়ার বেশবাস, দেহ ভঙ্গিমা, তার মুখের ব্যঞ্জনা আর গলার স্বর একই ভাব ব্যক্ত করছে : এ অন্যায়—যা হওয়া উচিত, হচ্ছে না। যার জন্য বেঁচেছ কি এখনও বেঁচে আছ তার সবই মিথ্যা—শুধু জীবন-মৃত্যুর আসল রূপ আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

আবার এই চিন্তা দেখা দেবার পরেই তার ঘৃণা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণাবোধ ফিরে আসে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসে দুর্নিবার আসন্ন পরিণামের ভীতি। এর সঙ্গে আর একটা নতুন অনুভূতিও যুক্ত হয়। বেদনাটা সুতীব্র হয়ে ওঠে—ভেতরটা পিষে যাচ্ছে মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে দমও যেন আটকে আসে।

'কতকটা' বলবার সময় তার মুখের ব্যঞ্জনা বিভীষিকাময় দেখাচ্ছিল। কথাটা বলেই সরাসরি তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকান; তারপর তার মত দুর্বল লোকের পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুতভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, চলে যাও! চলে যাও—আমায় একলা থাকতে দাও!



আর্তনাদ শুরু হবার পর একটানা তিনদিন ধরে কঁকানি কাতরানি চলে। এই আর্তনাদ এত মর্মান্তিক যে বন্ধ কপাটের ওপাশ থেকে শুনলেও আঁতকে উঠতে হয়। যে মুহূর্তে স্ত্রীর কথার জবাব দিলেন তখনই তিনি বুঝতে পারলেন যে সব শেষ হয়ে এসেছে—আর ফিরবার উপায় নেই। বুঝতে পারলেন শেষের দিন আসন্ন অথচ তার শংকা-সন্দেহের কোন সমাধান হল না। সন্দেহ সন্দেহই রয়ে গেল।

—ও—হো—হো! বিভিন্ন স্বরে তিনি খেদোক্তি করে ওঠেন। 'না—না' বলে তিনি আর্তনাদ শুরু করেন কিন্তু শেষ অবধি আ-আ ধ্বনিই শোনা যায়।

অদৃশ্য দুর্নিবার এক শক্তি তাকে যেন অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে সবলে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। সেই অন্ধকারের গর্ভে পুরো তিনটি দিন অসহায়ের মত তিনি সংগ্রাম করেন। এই তিন দিন তার কাছে সময়ের কোন অস্তিত্ব ছিল না। মৃত্যুদণ্ডিত মানুষ পরিত্রাণের আশা ত্যাগ করে জহ্লাদের সঙ্গে যেমন লড়াই করে, তিনিও এই তিনটি দিন তেমনিভাবে সংগ্রাম করেছেন। আর প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছেন যে আপ্রাণ চেষ্টা সত্বেও ক্রমাগত বিভীষিকাময় সুনিশ্চিত পরিণামের দিকে এগিয়ে চলেছেন। অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবার জন্যই তিনি সবচাইতে বেশী মনস্তাপ ভোগ করেন। আর তার চাইতেও বেশী করেন প্রতিকারহীনতার জন্য। সদ্ভাবে জীবন যাপন করেছেন এই আত্মপ্রসাদ নিয়ে তিনি এই গহ্বরে প্রবেশ করতে পারছেন না। জীবনের এই যৌক্তিকতার অভাবের জন্যই দৃঢ়ভাবে প্রাণ আঁকড়ে থাকতে

চাইছেন—একপাও অগ্রসর হতে চাইছেন না। আর এইটেই তার চরম অন্তর্দাহের প্রধান কারণ।

সহসা কোন একটা শক্তি যেন তার বুকে ও কোঁকে সবলে আঘাত হানে। দম নিতে আরও কষ্ট হয়। দ্রুত তিনি অন্ধকারের অতলে নেমে যান। গহ্বরের শেষ প্রান্তে অবশ্য জ্যোতিরেখা ছিল। রেলে চড়ে যাবার সময় অগ্রগতি সত্ত্বেও কেউ যদি মনে করে যে পেছনে চলেছি এবং অকস্মাৎ গতির আসল প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তাহলে তখন তার মনে যে আলোড়ন দেখা দেয়, ইভান ইলিচের মানসিক অবস্থাও কতকটা তার সঙ্গে তুলনীয়।

আপন মনে তিনি বলে ওঠেন, সত্যি, জীবনে সবকিছুই সাচ্চা ছিল না। কিন্তু এ তেমন গুরুতর কিছু নয়। এ ত্রুটি সংশোধন করা যেতে পারে। কিন্তু আসল সাচ্চা জিনিস কি ? সহসা নিজেকে জিজ্ঞাসা করে তিনি চুপ করে যান।

তৃতীয় দিনের শেষের দিকে এই ব্যাপার ঘটে। তার মৃত্যুর মাত্র দুঘণ্টা আগে। ছেলেটি চুপি চুপি ঘরে ঢুকে তখন তার বিছানার কাছে যায়। মুমূর্ষু লোকটি তখন হাত-পা ছুঁড়ে আর্তনাদ করছে। তার হাতখানা ছেলের মাথার উপর পড়ে। বালক পুত্র সেই হাতখানি ধরে ঠোঁটের উপর চেপে কাঁদতে শুরু করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ধপ করে তিনি গহ্বরের অতলে পড়ে যান এবং জ্যোতি শিখাটি তার চোখে পড়ে। তখন উপলব্ধি করেন যে নিজের জীবনযাত্রা যথাযথ না হলেও ত্রুটি-বিচ্যুতি যা ছিল তা সংশোধনাতীত নয়। আবারও নিজেকে প্রশ্ন করেন ঃ

আসল সাচ্চা জিনিস কি? তারপর নীরবে কান পেতে থাকেন।

এই সময় তিনি অনুভব করেন, কে যেন তার হাতে চুমু খাচ্ছে। চোখ খুলে পুত্রের দিকে তাকান। বড্ড মায়া হয় তার জন্য। স্ত্রীও তখন কাছে এগিয়ে আসেন। পলকের জন্য তার দিকেও চোখ ফেরান। মুখ হাঁ করে তিনি চেয়ে আছেন স্বামীর দিকে। তার গালে নাকে অশ্রুধারা আর চোখে হতাশ দৃষ্টি। তার জন্যও দুঃখু হয় ইভান ইলিচের।

ভাবেন : সত্যি, আমিই এদের জীবন দুর্বহ করে তুলেছি। ওরা দুঃখু করছে কিন্তু আমি মরে যাওয়া ওদের পক্ষে ভাল। কথাটা তার বলবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু সে সামর্থ্য ছিল না।—তাছাড়া, বলবই বা কেন? আমায় কাজে দেখাতে হবে। স্ত্রীর দিকে চেয়ে ইশারায় ছেলের কথা বুঝিয়ে বলেন, ওকে অন্যত্র নিয়ে যাও···ওর জন্য দুঃখিত···দুঃখিত তোমার জন্যও। 'ক্ষমা করো' কথাটা বলবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু জড়িয়ে গেল। হাতের ইশারায় তিনি বিদায় দেন। মনে মনে ভাবেন, "অন্তর্যামী তো বুঝবেন, তাহলেই হল।

সহসা তিনি উপলব্ধি করেন যে এতকাল যারা তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে এবং কিছুতেই ছেড়ে যেতে চায়নি, এখন যেন একদিক নয়, দুইদিক নয়—দশদিক থেকে, সব দিক থেকে তারা একে একে বিদায় নিচ্ছে। তাদের জন্য দুঃখু হয়। এরা যাতে ব্যথা না পায় সেইভাবেই কাজ করতে হবে। এদের মুক্তি দিতে হবে আর নিজেকেও মুক্ত করতে হবে বেদনা থেকে।

ভাবেন, কত ভাল—কি সহজ! কিন্তু যন্ত্রণাটা? তার কি হল? কোথায় তুমি—যন্ত্রণা!

তখন সেই দিকেই মনঃসংযোগ করেন।

—হাঁ, এই সে রয়েছে! কিন্তু এর কি হবে? বেশতো, থাকুক না।

—কিন্তু মৃত্যু…কোথায় মৃত্যু?

এর পর তিনি অন্তরের মৃত্যুভীতি পাঁতি পাঁতি করে খোঁজেন। তার সন্ধান পাওয়া গেল না।

—কোথায় লুকলো? কোথায় মৃত্যু?

মৃত্যু বলে কিছু নেই তাই কোনও ভয়ও তার ছিল না।

মৃত্যুর পরিবর্তে ছিল জ্যোতি।

—ওঃ, তাহলে এই-ই সেই! কি আনন্দ! সহসা তিনি চীৎকার করে বলে ওঠেন।

পলকের মধ্যে এইসব কিছু ঘটে যায়। কিন্তু তার কাছে এই পলকের তাৎপর্য বদলাল না। উপস্থিত লোকজনের কাছে তার যন্ত্রণা আরও ঘণ্টা দুয়েক চলে। গলায় একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ শুরু হয়। শীর্ণ দেহ মোচড় দিতে থাকে। তারপর মহাশ্বাস। গলার ঘড়ঘড়ানিও ক্রমেই কমে আসে। শ্বাসও বিলম্বিত হয়।

পাশের একটি লোক বলে ওঠে, নিভে এসেছে।

কথাটা তার কানে যায়। নিজের অন্তরেও তার পুনরাবৃত্তি করেন।

আপন মনে বলেন, মৃত্যু শেষ হয়ে গেছে। আর তার অস্তিত্ব নেই।

সহসা তিনি একটা শ্বাস টানেন। দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে শ্বাসটা থেমে যায়। অমনিই সারা দেহ টান হয়ে যায়···তারপর সব শেষ!

